নভেম্বর ২০২৫ ■ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩২

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা





আবিদা সুলতানা, দশম শ্রেণি, বাংলা বাজার সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা



জাকিয়া আক্তার, ষষ্ঠ শ্রেণি, হাজী গোলাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ

সম্পাদকীয়

ছোট্ট শিশু ঘুমাতে না চাইলে মা ভূতের ভয় দেখান, দৈত্যের গল্প বলেন। বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় গা ছমছম হারিকেনের আলোয় গোল হয়ে বসে দাদুর মুখে ভূতের গল্প শোনা এক অনন্য অভিজ্ঞতা। এভাবেই শিশু বয়স থেকেই আমাদের মনে ভূতের ভয় তৈরি হয়। কেউ একা ঘর থেকে বাইরে যেতে ভয় পায়। কেউবা ছোট্ট একটু শব্দে চমকে ওঠে। মনে হয় কেউ যেন ডাকছে, কেউ যেন আছে আশপাশে। যখন কোথাও কেউ একা থাকে তখনই সাধারণত এ ধরনের অনুভূতির সৃষ্টি হয়। অন্ধকার, নীরব, পরিত্যক্ত জায়গায় বাতাসের শো শো শব্দেও কেউ আছে বলে মনে হয়। যদিও বৈজ্ঞানিকভাবে ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি। মানুষের শরীর, মন ক্লান্ত থাকলে বা অন্ধকার পরিবেশে মস্তিষ্ক হ্যালুসিনেশনের শিকার হতে পারে। আবার কেউ মনে করে, দুর্ঘটনায় কেউ মারা গেলে বা কারো অপমৃত্যু হলে অতৃপ্ত আত্মাও ভূত হয়ে যায়, ভূত শিকার বা ভূতের ঘটনাকে ছদ্মবিজ্ঞান (Pseudoscience) বলে। ভূত নিয়ে আমাদের লোকজ সংস্কৃতিতে বিভিন্ন গল্প, কাহিনি রয়েছে তবে বাস্তবে ভূতের কোনো অস্তিত্ব নেই।

বন্ধুরা, তোমরা কেউ কি কখনো ভূত দেখেছো? অথবা তোমরা ভূতের গল্প শুনেছো? ভূতের যেহেতু অস্তিত্ব নেই, তাই ভূত গল্পের উপজীব্য ভাবাটাই যথেষ্ট। বাস্তবের সিদ্ধান্ত নিতে হয় ভূত দেখে নয়, বিজ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে।

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
ই-মেইল :
editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
শাহিদা সুলতানা

সম্পাদক
চৌধুরী সাহেলা পারভীন

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

সূচি

নিবন্ধ

২৮ ছড়া কবিতায় ভূতের জগৎ/ মো. ইকবাল হোসেন
৬২ ভূত নিয়ে যত মিথ/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

গল্প

০৭ ভূত থাকে মামির গাঁয়ে/ মুস্তাফা মাসুদ
১৪ কাঠুরে ভূত/ আফরোজা পারভীন
১৯ নজরুলের ভাবনায় ভূত/ পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য
২২ নিজ গাঁয়ের ভূত/ আহমেদ টিকু
২৪ ভূত্র/ জসীম আল ফাহিম
৩০ মনের ভূত/ সালাহ উদ্দিন আহমেদ মিন্টু
৩২ লিলিপুটের ছানা/ মো. মোশফিকুর রহমান
৩৬ ফিকলু/ সাবরিন সুলতানা
৩৮ ভৌতিক রাত/ মোস্তাফিজুল হক
৪১ অক্ষর চেনা ভূত/ মির্জা রিজওয়ান আলম
৪৩ ভূতুর গণিত শেখা/ পল্লব শাহরিয়ার
৪৯ মামদো ভূতের জাদুর পুকুর/ শুভ জিত দত্ত
৫১ তেঁতুলতলির ভূত/ মুহাম্মদ রফিক ইসলাম

প্রতিবেদন

৫৭ বাংলাদেশের ভৌতিক কিছু জায়গা
শাহানা আফরোজ
৫৯ গ্রাম বাংলার ভূত/ সরোয়ার আলম
৬১ বিশ্ব ভূত দিবস/ তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
৬৩ ভূতের প্রবাদ প্রবচন/ আনিসা নাওয়ার

কবিতাগুচ্ছ

১৩ সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম/ মোহাম্মদ নাজমুল হাসান
২১ ডা. হারুন-অর-রশিদ
২৭ মো. আবুল কালাম/ মোশারফ হোসেন
৩৫ ফেরদৌস জামান খোকন/ মো. আবুল হোসেন
৪০ মজনু মিয়া/ শামসুল আরেফীন
মো. মোজাম্মেল হক
৪৭ মো. আব্দুল কুদ্দুছ/ ফারহানা খান
মো. মাহবুবুর রহমান
৪৮ আব্দুল্লাহ আল মুহসিন/ মো. তাজুল ইসলাম তপন
মো. আরিফুর রহমান/ মো. রনি আহমেদ
৫০ মামুন সরকার
৫৩ নারায়ণ চন্দ্র মণ্ডল

ছোটোদের ছড়া

৪৬ মো. কাওসার আহমেদ

ছোটোদের লেখা

৫৬ কে?/ সাইফান মাসুদ আলী

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : আবিদা সুলতানা/ জাকিয়া আক্তার
তৃতীয় প্রচ্ছদ : মীর্জা মাহের আসেফ/ তাহসিন ইসলাম রুহি
শেষ প্রচ্ছদ : আবু সালেহ
০৫ আরিকা হোসেন/ ফামিন আজিজ
২৭ শারিকা তাসনিম নিধি
৬৪ মাইশা মেহজাবিন/ আরিশা হাসান

নবারুণ পত্রিকা পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে

Nobarun Potrika

www.dfp.gov.bd






ভূতের অস্তিত্বের ধারণা বহু প্রাচীন। এটি কেবল এক ধরনের গল্প নয়, বরং বিশ্বের বিরাট একটি অংশের বিশ্বাস। এই বিশ্বাস থেকে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে নানান লোককাহিনি তৈরি হয়েছে। বেশিরভাগ মানুষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কারণে ভূতে বিশ্বাস করেন। আবার অনেক মানুষ অতিপ্রাকৃত বিষয়গুলো বিশ্বাসযোগ্য করে গল্প সবার কাছে বলে বেড়ান। মূলত ভূতের গল্প শোনায়, ভয় পাওয়ায় বা ভৌতিক বাড়ি ঘুরে বেড়ানোয় যে আনন্দ আছে- সেটাই হয়তো ভূতের মিথ ছড়ানোর আসল উদ্দেশ্য।কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এক নয়। ভূত কী তা নিয়ে সর্বজনীনভাবে সম্মত কোনো সংজ্ঞা নেই। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যেসব আত্মা পথ হারিয়ে ফেলে তারা ভূত হয়ে যায়। আবার কেউ দাবি করেন, ভূত আমাদের মনে গেঁথে থাকা টেলিপ্যাথিক সত্তা। কেউ কেউ আবার ভূতের নানা নামকরণ করেন- মেছোভূত, গেছোভূত, ডাইন ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিকভাবে ভূতের অস্তিত্ব মূল্যায়নে একটি বড়ো বাধা হলো- যেসব বিষয়কে 'ভূত' বলা হয় তার ধরন খুবই বৈচিত্র্যময়। যেমন- একটি দরজা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া, চাবি হারিয়ে যাওয়া, ঠাণ্ডা অনুভব বা মৃত আত্মীয়ের উপস্থিতি দেখা। মানুষ এসবকে ভূতের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে। এগুলো সবই কল্পনাপ্রসূত। এগুলোর পেছনে কোনো যুক্তি নেই। সবশেষে বলা যায়, ভূত নিয়ে মানুষের উৎসাহ অনেকাংশে কল্পনা ও সংস্কৃতির ফল- যা প্রমাণের নয়, গল্প করার জন্যই টিকে আছে। যদি ভূত থেকে থাকে এবং তারা এমন কোনো জৈবিক বা শক্তির রূপ হয় যা এখনো বিজ্ঞান শনাক্ত করতে পারেনি, তাহলে বিজ্ঞানীদেরই একদিন তা প্রমাণ করতে হবে। শত শত বছর খোঁজাখুঁজির পরও আজ পর্যন্ত ভূতের কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।

ভূতুড়ে খেলা

সুকুমার রায়

পরশু রাতে পষ্ট চোখে দেখনু বিনা চশমাতে,
পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা করছে খেলা জোছ্নাতে।
কচ্ছে খেলা মায়ের কোলে হাত-পা নেড়ে উল্লাসে,
আহলাদেতে ধুপধুপিয়ে কচ্ছে কেমন হল্লা সে।



শুন্‌তে পেলাম ভূতের মায়ের মুচ্‌কি হাসি কট্‌কটে-
দেখছে নেড়ে ঝুন্‌টি ধ'রে বাচ্চা কেমন চট্‌পটে।
উঠছে তাদের হাসির হানা কাষ্ঠ সুরে ডাক ছেড়ে,
খ্যাঁশ খ্যাঁশানি শব্দে যেন করাৎ দিয়ে কাঠ চেরে!
যেমন খুশি মারছে ঘুঁষি দিচ্ছে কষে কানমলা,
আদর ক'রে আছাড় মেরে শূন্যে ঝোলে চ্যাং দোলা।
বলছে আবার, 'আয়রে আমার নোংরামুখো সুঁটকো রে,
দেখ না ফিরে প্যাখনা ধরে হুতোম-হাসি মুখ করে!
ওরে আমার বাঁদর-নাচন আদর-গেলা কোঁত্‌কা রে!
অন্ধবনের গন্ধ-গোকুল, ওরে আমার হোঁত্‌কা রে!
ওরে আমার বাদলা রোদে জষ্ঠি মাসের বিষ্টি রে,
ওরে আমার হামান-ছেঁচা যষ্টিমধুর মিষ্টি রে।
ওরে আমার রান্না হাঁড়ির কান্না হাসির ফোড়নদার,
ওরে আমার জোছনা হাওয়ার স্বপ্নঘোড়ার চড়নদার।
ওরে আমার গোবরাগণেশ ময়দাঠাসা নাদুস্ রে,
ছিঁচকাঁদুনে ফোক্‌লা মানিক ফের যদি তুই কাঁদিস রে-'

এই না ব'লে যেই মেরেছে কাদার চাপটি ফট্ করে,
কোথায়-বা কি, ভূতের ফাঁকি- মিলিয়ে গেল চট্ ক'রে!

[সংকলিত]



আরিকা হোসেন, দ্বিতীয় শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

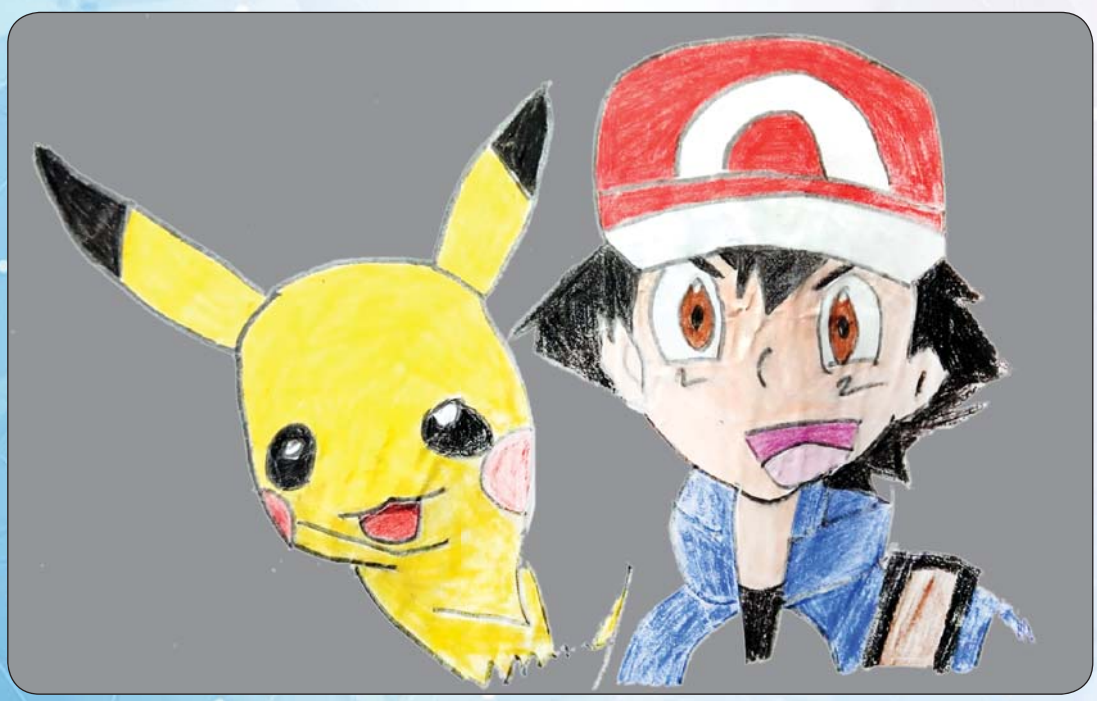

ফামিন আজিজ, পঞ্চম শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি উচচ বিদ্যালয়





ভূত থাকে মামির গাঁয়ে

মুস্তাফা মাসুদ

ক্লাস নাইনের ফাইনাল পরীক্ষায় এবার আমি ফার্স্ট হয়েছি। দিন পনেরো পর নতুন ক্লাস শুরু হবে। গত বছর সেকেন্ড হয়েছিলাম বলে মনটা খুব খারাপ হয়েছিল। এবার ফার্স্ট হয়ে সেই মন খারাপের কালো মেঘ আর নেই। মনটা ভারি ফুরফুরে। তাই ক্লাস শুরুর আগের এই কটা দিন তো উপভোগ করা যায়– এমন ভাবনা মাথায় আসতেই বন্ধু রফিককে বললাম, দোস্ত কী করা যায় বল তো?

রফিক আমার ক্লাসমেট। তবে আমার মতো ফার্স্ট-সেকেন্ড হয় না। ত্রিশজন ছাত্রের মধ্যে ওর রোল নম্বর বরাবরই বিশ– নট নড়ন-চড়ন। সেই ক্লাস সিক্স থেকেই এমনটা দেখে আসছি। বন্ধুরা তাই ওকে ডাকে মি. বিশ বলে। কেউ আড়ালে-আবডালে ডাকে চারশো বিশ মানে ফোর টোয়েন্টি। একথা জেনেও রফিক অখুশি হয় না। কিছু মনেও করে না।

তো, এই হলো আমার বন্ধু রফিক। সাদামনের দিলখোলা মানুষ। আমি ওকে খুব পছন্দ করি। ভালোবাসি। ওর কথায় ভরসা পাই। তাই তো রোল নম্বর এক আর বিশে বন্ধুত্ব হতে কোনো সমস্যা হয়নি; বরং ক্লাসের বাইরে ওকেই আমি এক কথায় গুরু মানি।

আমার পনেরো দিনের ছুটি এনজয় করার কথা শুনে খুশিতে রফিকের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বড়োদের মতো করে চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবে। তারপর বুড়ো আঙুলে তুড়ি বাজিয়ে বলে– আইডিয়া একটা পেয়েছি দোস্ত। আমরা এবার ভূতের বাড়ি বেড়াতে যাবো। ভূতের বাড়ি থাকব। দাওয়াত খাবো। আনন্দ-ফূর্তি করব। ব্যাস, এই। এখন বল– আইডিয়াটা তোর পছন্দ কী না।

ভূতের কথা শুনেই কেমন যেন গা-টা শিরশির করে ওঠে আমার। গায়ের লোমগুলো দাঁড়িয়ে যায় মুহূর্তেই। কিন্তু তা রফিককে বুঝতে দেই না। মুখে রাগের ভাব এনে বলি– ইয়ার্কি হচ্ছে, না! ফাজলামোর আর জায়গা পাস না! ভূতের বাড়ি দাওয়াত খাবি!

রফিক আমার রাগ গায়ে মাখে না। তারপর ও যা বলল, তাতে মুহূর্তে রাগ পানি। ও আমার পিঠে হাত রেখে বলে– দোস্ত, ইয়ার্কিও না ফাজলামোও না। আই অ্যাম সিরিয়াস। তোর না এক মামা আছে কালিয়া থানার বামনডাঙ্গা গ্রামে? তুই কতবার বলেছিস– তোর মামা-মামির নাকি ভূতদের সাথে খাতির আছে। তাদের বাড়ি দাওয়াতও খেয়েছেন তারা।

মুহূর্তেই মনে পড়ে মামা-মামির কথা। ভূতের কথা। আসলে ওখানে মামার পৈতৃক বাড়ি না। শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুরের একটা মাত্র মেয়ে মানে আমার মামি ছাড়া আর কেউ ছিল না। নানা ছিলেন পীর, তিনি বেশ আগেই মারা গিয়েছেন। তার বিশাল সম্পত্তি দেখভাল করবে কে! তাই মামা-মামির সেখানেই থাকা।

সেই মামার বাড়ি, মানে মামির বাড়ির সাথে ভূতের সম্পর্কের কথা আমি এতদিন প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। মামি আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসে কতবার বলেছেন– তিনটে জিন নাকি নানার বশে ছিল, মানে নানা যা বলতেন তারা তা-ই শুনত। বড়ো বড়ো ভূতেরা নাকি এই জিনদের ভয় পেতো, সেই সাথে নানাকেও।

মামির মুখে তখন তো স্রেফ গল্প শুনেছি। তেমন কিছু মনে হয়নি। কিন্তু এখন সেখানে যাওয়ার কথা শুনে বিষয়টি আর হালকাভাবে নিতে পারছি না। আবার ভয় পেয়েছি– এমন ভাবও দেখানো যাচ্ছে না। আফটার অল প্রেস্টিজ বলে কথা! তাই কায়দা করে বলি– ব্যাপারটা তো ভালো করে জানিই না আমরা । তো, কীভাবে বুঝব ওখানে গেলে থ্রিলিং কিছু দেখতে পাবো ভূতের বাড়িতে...

রফিক এবার বলে– দোস্ত, তোর শরীরের লোমগুলো এখনই যেভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দেখছি, তাতে আর ওখানে যেতে ভরসা পাচ্ছি না। ফিট হয়ে যাস কিনা ভয় পেয়ে। তুই যা ভীতুর ডিম!

আমি বলি– অনেক বলেছিস দোস্ত। আর খোঁচা দিস না। ভূত ব্যাটাদের কথা শুনলে ওরকম একটু লোম খাঁড়া হতেই পারে। এটা উত্তেজনার জন্য। কিন্তু আসলে ব্যাটাদের আমি কোনোদিন চোখে দেখিনি। ওদের বাড়িতে যাইনি। দাওয়াতও খাইনি। তবে মামা-মামি নাকি ভূতদের ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা দেখেছেন। তারা নাকি ভূতের বাড়ি দাওয়াত খেয়েছেন। তাদের গান শুনেছেন। ভূতের নাচও দেখেছেন। ভূতগুলো নাকি খুব ভালো। কোনো ক্ষতি করে না। এসব কথা মামির মুখে শোনা।

ভূতগুলো খুব ভালো– মামির এ কথাটা মনে পড়তেই মুহূর্তে আমার সব ভয় দূর হয়ে যায়। আর কী আশ্চর্য, গায়ের লোমগুলোও এখন আর খাড়া হচ্ছে না। আমি রফিককে বলি– দোস্ত, দেরি করা ঠিক হবে না। চল্, কালই আমরা রওনা হই মামির বাড়ি। রফিক বলল– ওকে। তাই হবে দোস্ত।

রাতে খাওয়ার সময় বাবা-মার সামনে আমি মামির বাড়ি যাওয়ার কথাটা বলি। বাবা খুশি হলেও মা খুব সিরিয়াস– না, পিন্টু যাবে না। ওই ভূতের আড্ডায় আমার ছেলেকে আমি যেতে দেবো না।

বাবা এবার কায়দা করে বললেন– বিবি মরিয়ম, তুমি দেখি সিরিয়াস হয়ে গেছো। আর ভূত বলে কিছু থাকলেও তোমার ভাই-ভাবিদের বামনডাঙ্গায় নেই। আমি হলফ করে বলতে পারি– ওসব গুজব। বানানো কথা। ও হলো তোমার ভাই-বউয়ের কেরামতি জাহির করার কৌশল, বুঝেছ? সুতরাং নো চিন্তা, নো ভয়।

মা তবুও নিশ্চিন্ত হন না। তার কথা– নাসিমের বউ পীরের মেয়ে। সে কি মিথ্যে বলবে... তার বাপ মানে, আমাদের তালুই সাহেব জিন পুষতেন, এটা তো মিথ্যে নয়।

বাবা এবার আরো কায়দা করে বললেন– তালুই সাহেব পুষতেন বলে তোমার ভাইয়ের বউ নূর বানুও পুষবেন এমন তো কথা নেই। শোনো, জিন-ভূত কারো চাকর বা গোলাম না যে, তারা বংশপরম্পরায় কাজ করবে। শোনো, তুমি এ যুগের লেখাপড়া জানা মানুষ। ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট আহসান হাবিব পিন্টুর মা। আর আমার কথা না হয় না-ই বললাম। তোমার কি এই ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করা মানায়! তুমি না আধুনিক নারী!

বাবার এবারের খোঁচায় মা ধান্দায় পড়ে যান। আমতা-আমতা করে বলেন– ঠিক আছে যাক, তবে আমার একটা শর্ত আছে। শর্ত হলো– আমিও যাবো ওদের সাথে।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলেন– তুমি এখন কীভাবে যাবে? এখন ধানের মওসুম। আমি যাবো অফিসে, ফিরব সেই সন্ধ্যায়। এদিকে তুমি না থাকলে সব ধানই তো চলে যাবে মজুর-কামলাদের বাড়িতে। এটা কি ঠিক হবে, বলো?

মা এবার কঠিন বাস্তবে ফিরে আসেন। তাই তো! সোনার বরণ এত্ত এত্ত ধান। এই ধানই তো সংসারের লক্ষ্মী। ফালতু ভূতের চিন্তায় সেই লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলে এখন কোথায় যাবেন তিনি! তাছাড়া ছেলে এখন বড়ো হয়েছে না! সোনার টুকরো ছেলে আমার। যাক না, কদিন বেড়িয়ে আসুক। আল্লাহ্ ভরসা।

পরদিন খুব সকালে ডেকে দিলেন মা। গরম ভাত-তরকারি সব রেডি। আমি খেতে খেতে রফিকও চলে আসে। তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠি। ব্যাগ রাতেই গোছানো ছিল। বাবা-মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চাঁড়াভিটা নড়াইল বাসস্ট্যান্ডে। তারপর বাসে নড়াইল, সেখান থেকে কালিয়া; অতঃপর বামনডাঙ্গা মামির বাড়ি।

মামির বাড়ির সামনে এক মহাকাণ্ড। রীতিমতো গেট সাজানো হয়েছে কলাগাছ কেটে, সাথে রঙিন কাগজের ফুলঝুরি। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা দু-দিকে সারি করে দাঁড়ানো। এক এলাহিকাণ্ড। আসলে ঘটনা হয়েছে কী, মা গতরাতে মামিকে ফোনে সব জানানোয় এতসব আয়োজন।

মামির বাড়িতে পৌঁছে খাওয়াদাওয়া করে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। উঠলাম যখন, তখন সন্ধেহয়ে এসেছে। এখন দারুণ ফ্রেশ লাগছে। হঠাৎ মামা-মামি ঘরে ঢুকলেন। মামি মামার দিকে তাকিয়ে বললেন– ময়নার বাপ, তুমি একটু বাজারে যাও। বাসু ময়রার দোকান থেকে দু'কেজি ফ্রেশ দই নিয়ে এসো। আর যাওয়ার সময় এই চিঠিটা উনাদের বাড়ির দরজা দিয়ে ভেতরে ফেলে যেয়ো।

মামা হাসিমুখে চিঠি নিয়ে চলে গেলেন। আমি তখন মামির কথা শুনে রীতিমতো ঘামতে শুরু করেছি। রফিকের অবস্থাও সুবিধের না। মামি 'উনাদের' কাছে চিঠি পাঠালেন– এর মানে কী? মামির কি ভূতদের সাথে চিঠি চালাচালি হয়! আসলে তিনি কী মানুষ, না ওই 'উনাদের' কেউ সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হতে লাগল। মনে মনে ভাবি, বেড়ানোর নামে এ কোন ভূত-পেতনির আস্তানায় এসে পড়লাম রে বাবা! বারবার মায়ের কথা মনে হতে থাকে। তারপরও কিন্তু মনের জোর আর সাহস হারাই না।

আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে মামি আদুরে গলায় বলেন– ভয় পেয়েছিস, বাবা? আচ্ছা বল, তোরা এসেছিস সে-খবর 'উনাদের' দিতে হবে না? আমি তোদের বাড়িতে কী বলেছিলাম মনে নেই? আমি বলেছিলাম না– উনাদের বাড়ি দাওয়াত খাবি। নাচ



দেখবি। গান শুনবি। এ জন্যেই তো তোদের খবর উনাদের কাছে পাঠালাম। ভয় পাস কেন?

মামিকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল– মামি, তুমি আসলে কে! কিন্তু 'কাল' সন্ধ্যায় জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না। আবার নীরবতা ভাঙলেন মামি– বাবা পিন্টু, আমি বুঝতে পারছি তোমরা ভয় পাচ্ছো। আসলে সন্ধ্যায় বা রাতে উনাদের কথা বেশি আলোচনা না করাই ভালো। ঠিক আছে, তোমরা একটু থাকো। আমি রান্নার তদারকিটা করে আসি।

মামি চলে গেলে আমি রফিকের পিঠে খোঁচা দিয়ে বলি– দোস্ত, কী বুঝলি? ভয় পাচ্ছিস নাকি? রফিক বলে– কিছু বুঝতে পারছি না দোস্ত। মামি যেভাবে কথাবার্তা বললেন তাতে তো মনে হয় ভূত-পেতনি তার আত্মীয় আর পাড়াপড়শির মতো। যেন কোনো ব্যাপারই না। তোর কী মনে হয়?

আমি আস্তে আস্তে বলি– আমারও তাই মনে হয়। তবে ওয়েট অ্যান্ড সি।

একটু পর মামি আবার এলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মামাও এলেন। তার হাতে একটা বড়ো দইয়ের ভাণ্ড। মামা দইয়ের ভাণ্ড মামির হাতে দিয়ে বলেন, স-ব ঠিক। তোমার চিঠির জবাবও নিয়ে এসেছি গরম গরম। এই যে চিঠি। মামা চিঠিটা দেন মামির হাতে।

সাদা খামের মধ্যে চিঠিটা ভরা। খাম দিয়ে রজনীগন্ধার তীব্র সেন্ট আসছে। মুহূর্তে সারাটা ঘর যেন সুগন্ধে ভরে গেল। মামি চিঠিটা বের করে নিঃশব্দে পড়তে লাগলেন। আমি আর রফিক ভয়ে ওদিকে তাকাতেই পারছি না। একটু পরে মামি ফিসফিস করে বললেন– তোমরা এসেছ জেনে উনারা খুব খুশি হয়েছেন। আগামীকাল অমাবশ্যা। ওইদিন রাত বারোটায় উনাদের ওখানে তোমাদের দাওয়াত দিয়েছেন। খাওয়াদাওয়া হবে। নাচগান হবে।

কথায় কথায় রাত দশটা বেজে যায়। খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়ি। কিন্তু ঘুম আসে না। আস্তে আস্তে রফিককে বলি– দোস্ত, ভেবে দেখেছিস, ভূতেরা মামির চিঠির জবাবও দেয়। কী সাংঘাতিক কাণ্ড না? আমার তো এখন সব বিশ্বাস হচ্ছে। তোর?

রফিক বলে– হচ্ছে আবার হচ্ছেও না। কেমন যেন প্যাঁচ লেগে যাচ্ছে। মেলাতে পারছি না। জিন-ভূত কি এতই সস্তা যে, সহজে তাদের চিঠিও পাওয়া যায়। কথা শোনা যায়। কিন্তু অবিশ্বাস যে করব তার প্রমাণ কই? তবে আমার মনে খটকা লেগেই থাকছে। মনে হচ্ছে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।

সকালে যখন আমাদের ঘুম ভাঙল তখন বেলা বেশ হয়ে গেছে। মামি হরেক পদের নাশতার ব্যবস্থা করেছেন– চিতই পিঠা, পাকন পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা এমনি আরও কত রকমের পিঠা। আছে ছিটরুটি আর কাঁঠালের বিচি দিয়ে রান্না করা মুরগির গোশত। খেজুরগুড়ের পায়েস আর হাতে কাটা সেমাই। বড়ো বড়ো সবরি কলাও আছে আস্ত এক ফানা। কত আর খাওয়া যায়!

খাওয়ার পর রফিক হঠাৎ মামিকে বলে– মামি, ভূতদের বিষয়ে কিছু বলেন। ওরা কেন আপনার কথা শোনে আর ওই যে চিঠি–

রফিকের কথা শেষ করতে না দিয়ে মামি বলেন– এ কথা বাচ্চাদের কাছে বলা নিষেধ, কিন্তু তোমরা এখন বেশ বড়ো হয়েছ, তাই তোমাদের কাছে বলব। এরপর মামি ভূত কাহিনি যা বললেন তা সংক্ষেপে এই- মামির আব্বা ছিলেন জবরদস্ত পীর। তাঁকে নানা গাঁয়ে যেতে হতো, যেতে হতো অনেক দূরদূরান্তে। তখন তো আর রিকশা-ভ্যান-মোটরগাড়ি ছিল না, তাই নানাকে কষ্ট করে পায়ে হেঁটেই যেতে হতো। তার এই কষ্ট দূর করল তার শাগরেদ জিনেরা। তারা তাঁকে মানুষের বেশ ধরে পালকিতে করে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেত। নানা মারা যাওয়ার পর অনেক দিন এদের খোঁজ ছিল না। অনেক দিন পরে মামি একটা চিঠি পান জিনদের লেখা। তাতেই জানা গেল জিনেরা পীর সাহেবের মহব্বতে আবার ফিরে এসেছে তার মেয়ের খেদমতে। জঙ্গলের পুরনো পোড়োবাড়িতে থাকছে তারা। মামির যে-কোনো কাজে তারা এগিয়ে আসবে।

সেই থেকে আবার শুরু। মামা-মামি কয়েকবার গিয়েছেন সেই পোড়াবাড়িতে, তবে অমাবশ্যার রাতে। আলোহীন অন্ধকারে শুধু তাদের কথা শুনেছেন, খেয়েছেন, নাচগান উপভোগ করেছেন– সবই অন্ধকারে। দেখেননি কাউকে।

রফিক বলে– মামি, ওদের লেখা চিঠি কি একটু দেখা যায়? জাস্ট কৌতূহল, মামি। দেখতে মন চাইছে, তাই। মামি অনিচ্ছাসত্ত্বেও গতকালের চিঠিটা এনে দিলেন। তারপর বলেন– তোমরা দেখো, আমি গোসলটা সেরে আসি।

মামি চলে গেলেন। আমি আর রফিক পড়তে থাকি 'ভূতের চিঠি'। লেখা দেখে আমাদের খটকা লাগে। শুনেছি জিন-ভূতদের জন্ম কোহেকাফ পাহাড়ে। তারা এমন সুন্দর বাংলা অক্ষর শিখল কীভাবে! বলপেনের লেখা বলেই মনে হচ্ছে। দূর! চিঠিটাকে যেমন ভূতুড়ে আর রহস্যময় মনে করেছিলাম, একদমই সেরকম না। একদম সাদামাটা, যেন মানুষের লেখা।

কিছুক্ষণ পর মামি এলেন। আমরা চিঠিটা তার কাছে

দিয়ে বললাম– মামি, আমরা তো বেড়াতে এসেছি। তো গ্রামটা একটু ঘুরে দেখে আসি। চিঠির ব্যাপারে কিছু বললাম না বলে মামিও কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। শুধু বললেন– যাও, তবে জঙ্গলের ওই দিকটায় যেয়ো না।

আমরা গ্রাম দেখতে বেরোলাম। গ্রামের পুব দিকে জঙ্গলটা। আমরা ওই দিকেই আগে যাওয়া স্থির করলাম। আমরা হাঁটতে হাঁটতে সেদিকে এগিয়ে যাই। জঙ্গলের কাছাকাছি যেতেই একটি লোক পাশের তাল বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালো। লম্বা চুল-দাড়ি। সাধু-সন্ন্যাসীর মতো দেখতে। চমৎকার করে হেসে বলে– কই যাও বাবারা? ওদিকে তো ভূতের বাড়ি। তোমরা ছোটো মানুষ, জানে মারা যাবা।

আমি তখন বুদ্ধি করে বলি– তা আমরা জানি। আমি পীর সাহেবের মেয়ে-জামাইয়ের ভাগিনা আর ও আমার বন্ধু। কাল রাতে তো উনাদের ওখানে আমাদের দাওয়াত আছে, তাই ভাবলাম এদিকটা একটু ঘুরে যাই।

আমার কথা শুনে লোকটা আবার হেসে তাল বনের আড়ালে চলে গেল।

ভূতের বাড়ির সীমানায় পৌঁছাতেই আমাদের গা ছমছম করে ওঠে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে শত বছরের পুরনো একটা দালান বাড়ি। বড়ো বড়ো গাছের ডাল আর পাতায় জড়াজড়ি করে আছে। ছ্যাদলাপড়া দেওয়ালজুড়ে পরগাছার ছড়াছড়ি। এদিক-ওদিক তাকাই, তেমন কিছু নজরে আসে না। হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে যাই প্রাচীরের একেবারে পুব পাশে। সেখানে একটি বড়ো দরজা। এগিয়ে গিয়ে দেখি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তবে এটি যে প্রায়ই খোলা হয়, তা বেশ বোঝা যায়। কারণ, দরজাটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঝুল-মাকড়সার জাল নেই। বেশ ঝকঝকে। ভালো করে খেয়াল করে দেখি এখানে-ওখানে মানুষের জুতোর ছাপ। আমি রফিককে বলি– দোস্ত, আর কি কিছু বোঝার বা দেখার আছে? সব ক্লিয়ার, না?

রফিক আমার কথায় সায় দেয়। আমরা দ্রুত চলে যাই কালিয়া থানায়। তাদের সব জানালাম। পুলিশ অফিসার খুবই হেল্পফুল। ঠিক হলো আগামীকাল দাওয়াতের খানাপিনার হুল্লোড়ের মধ্যেই অ্যাকশন চালানো হবে।

পরদিন। রাত এগারোটা বাজতেই মামি আমাদেরকে তৈরি হতে বললেন। মামা-মামিও তৈরি হয়ে নিলেন। ঠিক সাড়ে এগারোটায় আমরা রওনা দিলাম। বিশ মিনিটের মধ্যেই আমরা ভূতের বাড়ির দরজায় পৌঁছে যাই। দেখি খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কালকের সেই লম্বা চুলো ব্যক্তিটি। আমরা ভেতরে ঢুকতেই সে দরজা বন্ধ করে দেয়।

বাড়ির ভেতরে গাঢ় অন্ধকার। আশপাশের কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু মানুষের চলাচল, ফিসফাস টের পাওয়া যাচ্ছে। মামা-মামি দেখি সেই অন্ধকারের

সাদা খামের মধ্যে চিঠিটা ভরা। খাম দিয়ে রজনীগন্ধার তীব্র সুবাস আসছে। মুহূর্তে সারাটা ঘর যেন সুগন্ধে ভরে গেলো। মামি চিঠিটা বের করে নিঃশব্দে পড়তে লাগলেন। আমি আর রফিক ভয়ে ওদিকে তাকাতেই পারছি না। একটু পরে মামি ফিস ফিস করে বললেন– তোমরা এসেছো জেনে উনারা খুব খুশি হয়েছেন। আগামী কাল অমাবশ্যা...

মধ্যেই গড়গড় করে হেঁটে যাচ্ছেন। আমরা যাচ্ছি তাদের হাত ধরে। একটু পর কে যেন গমগমে গলায় বলল– বুবু, দুলাভাই, সেলাম। মেহমান দুজনকেও সেলাম। আপনারা এসেছেন, সেজন্য আমরা খুব খুশি হয়েছি। সারাজীবন পীর হুজুরের নিমক খেয়েছি। এখন তার সাহেবজাদির খেদমত করতে পারলেই জীবন সার্থক হয়।

আমি আর রফিক বারবার কান খাঁড়া করে শোনার চেষ্টা করছি, কখন পুলিশের অ্যাকশন শুরু হয়। এবার গমগমে গলা আদেশ দেয়– খানা লাগাও। জলদি।

আমরা খাওয়ার জন্য মুখ-হাত ধোয়া শুরু করেছি, এমন সময় চারদিকে কেমন শোরগোল শোনা যায়। অন্ধকারে মাঝে মাঝে আলোর ঝিলিক খেলে– টর্চের আলো নিশ্চয়ই। সেই গমগমে গলা আর তার সাথিরা কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। মামা-মামিও না। শুধু রফিক আর আমি বুঝলাম– খেল্ শুরু হয়ে গেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যে পুলিশের হাতে সবাই ধরা পড়ে গেলো। কোথায় জিন আর কোথায় ভূত-পেতনি! পুলিশের টর্চের আলোয় দেখলাম, তাগড়া জোয়ান পাঁচজন পুরুষ আর তিনজন মহিলা। পশ্চিম দিকের গেটের লম্বাচুলো দারোয়ানও আছে তার মধ্যে। থানায় নেওয়ার পর জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেলো ওরা সবাই ডাকাত, পীর সাহেবের সুনাম ব্যবহার করে ডাকাতি করে বেড়ায় আর পোড়োবাড়িতে লুকিয়ে থাকে।

ওসি সাহেব আমাকে আর রফিককে ধন্যবাদ দিলেন। হেসে বললেন– তোমাদের জন্যই ওরা ধরা পড়ল। আর নকল জিন-ভূতের খেল খতম হলো।

মামা-মামি তখন অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকান। কিছুক্ষণ পর মামির ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ঝিলিক খেলে গেলো। বুঝলাম তিনি সবই বুঝতে পেরেছেন।

শিশুসাহিত্যিক



ভূত দেখেছ কেউ

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম

তোমরা কি কেউ ভূত দেখেছ
দেখতে নাকি কালো?
দাঁতগুলো তার খুব বড়ো আর
চোখে জ্বলে আলো?

বাঁশের ঝাড়ে লুকিয়ে থেকে
ভয় দেখাতে পটু,
নানান রকম আওয়াজ করে
শুনতে নাকি কটু?

সত্যিকারের ভূত দেখেছ
কেউ কি আছো এমন?
কোথায় থাকে ভূতপ্রেতেরা
ভূতের বাসা কেমন?

ভাঙা দোলনা

মোহাম্মদ নাজমুল হাসান

আঙিনাতে দোলনা একা
ঝুলে আছে ফাঁকা
বছর আগে ছিল অনেক কলরব
এখন সেখানে স্তব্ধ নীরব।

রাতে দোলনাটা দুলে ওঠে
কেউ বসেনি তবু নড়ে
চাঁদের আলো পড়ে তাতে
ছায়া নামে গোপন রাতে।

হালকা হাসির শব্দ ভাসে
মনে হয় শিশুরা খেলে পাশে
কাউকে দেখা যায় না চোখে
তাই তো ভয়টা জমে উঠে বুকে।



কাঠুরে ভূত

আফরোজা পারভীন

ভূতদের কী কোনো গ্রাম আছে, কোনো ঘরবাড়ি? কোথায় সেটা। কতদূর? নিশ্চয়ই আশেপাশে। ভূত যখন সব জায়গায় আছে, ওদের থাকার জায়গাও কাছাকাছি আছে। আয়েশা, তমাল আর ফরিদ বন্ধু। ক্লাস ফাইভে পড়ে ওরা। পাশাপাশি বাড়ি। প্রতিদিন কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে গল্প করে। গল্প যখন ঘণ্টা পেরোয় তখন সেটা হয়ে যায় আড্ডা। এই সংজ্ঞা ওদের দেওয়া। আজ দু'ঘণ্টা পেরোলো। তাই আজ ওদেরই 'আড্ডা' চলছে। আড্ডার বিষয় হলো, ভূতের ঘরবাড়ি, আবাসস্থল। অনেক আলাপ করল, তর্কবিতর্ক, গালে হাত দিয়ে ভাবনা, কিন্তু কোনো সমাধানে আসতে পারল না। কোথায় থাকে ওরা! ভূত আছে নিশ্চিত। এ বিষয়ে তিনজনই একমত। তিনজনই ভূত দেখেছে। ফরিদ দেখেছে বেণি দুলানো বিশাল লম্বা তিন পা ওয়ালা ভূত। সে পা রণপার মতো। সেটা পুরুষ না নারী ভূত বুঝতে পারেনি। ফরিদের ধারণা ওটা উভলিঙ্গ। উভলিঙ্গ বলাতে তর্ক জমেনি। না হলে বেণি নিয়ে তর্ক হতো। আয়েশা দেখেছে মেয়ে ভূত। তার খোপায় ফুল ছিল। এ নিয়ে কিছুটা তর্কবিতর্ক হয়েছে। প্রথমত ভূতেরা খোঁপা বাঁধে কিনা, বাঁধলে খোঁপার কাঁটা পায় কোথায়, খোঁপায় ফুল গোঁজে কিনা। শেষমেষ সমাধান না পেয়ে চুপ করে গেছে। তমাল বলেছে,

: ফুল থাকতেও পারে। ওদের দেশে তো অনেক ফুল।

: তুই জানলি কী করে? গিয়েছিস সেখানে?

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ফরিদ বলল।

: না না ওভাবে উড়িয়ে দিস না। ভূতরা সুন্দর। তাদের দেশে ফুলবাগান তো থাকতেই পারে।

: ভূতরা সুন্দর কে বলল? গাধা একটা। সুন্দর পরিরা। পরির কথা হচ্ছে না। হচ্ছে ভূত-পেতনির কথা। যারা দেখতে মারাত্মক! ফরিদ মুখ ঢাকল। যেন একশ একটা ভূত পেতনি দেখেছে সে। তমাল দমে গেল। মাঝপথে চুপ করে গেল সে। তমাল দেখেছে পুরুষ ভূত। জোব্বা পরা। লম্বা দাড়ি। বয়সে ছোটো। তার পকেট ভর্তি নুড়ি পাথর ছিল। ছুড়ে ছুড়ে সে পাথর মারছিল চারদিকে।

: কোথায় দেখেছিস? কোথায় কোথায়?

তিনজন তিনজনকে প্রশ্ন করল। তিনজনই তো তো করতে লাগল। বলতে লাগল, দেখেছি তো, দেখেছি ছাদে, গাছতলায়, পুকুরপাড়ে।

: ঘোড়ার ডিম দেখেছিস!

এরপর ওরা ঠিক করল, আচ্ছা এতদিন দেখেনি ঠিক আছে। সেসব নিয়ে কেউ কাউকে খোঁটা দেবে না। এবার ভূত দেখতেই হবে। বানানো ভূত না, আসল ভূত। বন্ধুরা সবাই ভূত দেখেছে, তারা দেখবে না এটা কেমন কথা! তারা কী কম আছে কারো চেয়ে কোনো দিক থেকে! আয়েশা ক্লাসে ফার্স্ট হয়, তমাল ফুটবলে পা দিলে আকাশে উড়ে যায়, ফরিদ আঁকাজোকায় চ্যাম্পিয়ন। আর তারাই কিনা ভূত দেখবে না, ভূতের গল্পই শুনে যাবে এটা হতে পারে না কিছুতেই।



ওরা ঠিক করল সামনের অমাবস্যায় ওদের ভূত দেখার মিশন। কিন্তু কোথায় সেটা নিয়ে আড্ডা গড়ালো তিনঘণ্টা। যুৎসই দুটো জায়গা আছে কাছাকাছি। কমলঘোষের বাগান আর কাঁঠালতলীর বাগান। তিনজনের দুই দল হয়ে গেল। অবশেষে টস। টসে নির্ধারিত হলো ওরা যাবে কমলঘোষের বাগানে। লোকে বলে ওখানে অনেক ভূত । গিজগিজ করে ভূতেরা। নানা ধরনের ভূত আছে ওখানে। মেছো ভূত, গেছো ভূত, মামদো ভূত, শড়া ভূত, তাজা ভূত, আরো অনেক নাম ভূতদের। ওখানে ভূতদের নাকি বংশমর্যাদাও আছে। অভিজাত বংশের ভূতেরা খারাপ বংশের ভূতদের সাথে সম্বন্ধ করে না। বিয়েশাদি, খৎনায় ডাকে না। যারা ওখানে গেছে মানে স্কুলের উপরের ক্লাসের ছেলেরা তারাই ফিরে এসে এসব গল্প বলেছে।

কমলঘোষের বাগানে দিনের বেলাতেও ভয়ে কেউ যায় না। ওখানেই যাবে ওরা। বাগানে অনেক কাঁটা আছে। থাক । 'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে'। তারা ক্ষান্ত হবে না। কিছুতেই না। আর কিছুতেই বাবা- মাকে বলা যাবে না। তিনজন হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করল।

আজ অমাবস্যা। দুপুরের পরই বের হলো ওরা গোপনে। সবার আব্বা তখন অফিসে, মায়েরা কাজে ব্যস্ত। কী কী সাথে নেবে এ নিয়ে ওদের লম্বা মিটিং হয়েছে। ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি ওরা। তারপরও সাথে নিয়েছে ব্যাগ। ব্যাগে আছে টর্চলাইট, বিস্কুট, পানি, কাঁচি আর একটা দড়ি। তিনজনই পরেছে টাইট প্যান্ট, গেঞ্জি আর কেডস। যাতে কাপড় না ঝোলে আর ডালপালায় আটকে না যায় তাই টাইট কাপড়। কমলঘোষের বাগানে দিনেই রাতের অন্ধকার। কস্মিনকালেও ওখানে আলো ঢোকে না। গাছে গাছে জড়াজড়ি করে অদ্ভুত এক জটলা বানিয়ে রেখেছে। সহজে এক পা হাঁটা যায় না। পদে পদে কাঁটা। ওরা ডাল কেটে কাঁটা সরিয়ে সরিয়ে, টর্চ মেরে মেরে আলো ফেলে পথ বানিয়ে এগোতে লাগল। কতরকম যে গাছ আর কত অদ্ভুত কাঁটা! বিচিত্র সব পোকামাকড়। কোনটার কামড়ে কী হবে কে জানে! কেমন এক অদ্ভুত বাতাস। শরীর শিরশির করে। তমাল বিড়বিড় করতে লাগল,

ভূত আমার পুত
পেতনি আমার ঝি
রাম লক্ষণ সাথে আছে
করবি আমার কী!

: কী বিড়বিড় করছিস? আয়েশা বলল,

: কিছু না।

ওদের ধারণা ফরিদ একটু বেশি ভীতু। যদিও সেটা ধরা দিতে চায় না। বলল,

: কেমন লাগছে না? গা শিরশির করছে না?

: করছে নাকি? ভয় লাগলে এখনই ফিরে যেতে পারিস।

ফরিদ আর কথা বলল না। একটু পর কিছু একটা সরসর করে সরে যেতে দেখে তমাল বলল,

: সাপ আছে না?

: থাকতেই পারে। ভয় পেলে ফিরে যেতে পারিস।

আয়েশা বলল,

: ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি সাহসী।

: সাহসী না ছাই!

এবার দু'জন একসাথে।

আর কেউ কোনো কথা বলল না, এগোতে লাগল। একটু পর ফরিদ উহ্ বলে পা টিপে ধরে বসে পড়ল।

: কী যেন কামড়ে দিল!

: কাটার ঘায়ে মূর্ছা যাচ্ছে। না পোষালে ফিরে যা।

তেড়ে উঠল ফরিদ,

: পেয়েছিস কী হ্যাঁ? পেয়েছিস কী? কথায় কথায় ফিরে যা, ফিরে যা। এটা কী তোর জমিদারি নাকি? যা ইচ্ছে তাই বলে যাচ্ছে। যেন কত বীরপুরুষ।

ওর দিকে ধেয়ে গেল তমাল,

আজেবাজে কথা বলবি না খবরদার!

প্রচণ্ড জোরে ধমকে উঠল আয়েশা।

: এই তোরা থামবি? না থামলে আমিই যাচ্ছি। আর



ফরিদ তুই ওসব বড়ো মানুষের মতো কথা কোথায় শিখলি? কাঁটার ঘায়ে মূর্ছা?

ফরিদ তো তো করে বলল,

: সকালে মা আব্বাকে বলছিল।

: তাই বল।

ও পিছন ফিরল। এবার দু'জন ওরা হাত ধরে মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল,

: আর হবে না।

ওরা হাসল। এক জায়গায় থেমে বিস্কুট আর পানি খেয়ে নিল। ক্রমশ ওরা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল। ততক্ষণে ওদের জামা ছিঁড়ে গেছে। হাত-পায়ের অনেক জায়গা দিয়ে রক্ত পড়ছে। এমন সময় আচমকা একটা অদ্ভুত ঠান্ডা বাতাস বয়ে গেল। পাখির কিচিরমিচির থেমে গেল অকস্মাৎ। ঝিঁঝি পোকার আলোও নিভে গেল। নিকষ কালো চারদিক। আয়েশা টর্চ জ্বালাতে গেল। তমাল ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে বলল,

: ইশ্ না। ওরা আসছে।

: কারা, ভূত?

: হ্যাঁ।

এরপর ডাল ভাঙার শব্দ শোনা গেল। বড়ো বড়ো ডাল ভেঙে ভেঙে পড়ছে যেন কোথায়। তারপর মনে হলো কুড়ালের শব্দ ক্রমাগত পড়ছে। কেউ যেন গাছ কাটছে। একজন দুজন না, অনেক।

তমাল বলল,

: সাবধান, ওরা সামনেই। ওই বড়ো গাছটার পেছনে লুকা।

ওরা একটা বড়ো গাছের পেছনে লুকিয়ে পড়ল। ভূতগুলো খানিকটা দূরে। আবছা দেখা যাচ্ছে ওদের। তারপর হঠাৎ করে আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক। তীব্র আলো। নিজেদের লুকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ল আলোর জন্য। ওরা গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে রইল পুটুলির মতো। ওরা দেখল বেশ কয়েকটা ভূত বড়ো বড়ো গাছ কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটছে। কেটে কেটে এক জায়গায় স্তূপ করছে। ওরা বুঝতে পারল না এখান থেকে এগুলো নেবে কী করে। এদিক দিয়ে নিয়ে যাবার রাস্তা আছে নাকি! নাকি মাটির নিচে রাস্তা, কে জানে। কিন্তু তারা কিছুতেই বুঝতে পারল না, এসব গাছ দিয়ে ভূতেরা কী করবে। ওরা তো মানুষের রক্তমাংস খায়। গাছ তো ওরা খায় না। ভূতই তো থাকে গাছে। তাহলে!

তমাল বলল,

: এরা তো দেখি কাঠুরে ভূত।

: অনেক রকম ভূতের নাম শুনেছি, কাঠুরে ভূতের নাম তো শুনিনি।

: এরা বোধহয় নতুন!

ওরা বুঝতে পারল, হাঁটতে হাঁটতে বহুদূর এসে পড়েছে। ভূতরা কথা বলছে আস্তে আস্তে। দু'একবার তাদের কথার দু'একটা কণা ছিটকে আসছে-

: সাবধান, চারদিকে নজর রাখো। আজকাল টিকটিকির উৎপাত বেড়েছে।

: ভাজ্ঞিস এখানে বন পুলিশ নেই।

মানে কী, ভূতরা কী বাংলা শিখেছে নাকি? আর কী কাণ্ড, ভূতরা পুলিশকে ভয় পায়। এমন কথা কেউ শুনেছে কখনও?

তমাল মাথা চুলকে বলল,

: ভূতরা তো নাকিসুরে কথা বলে, এরা তো দেখি স্পষ্ট স্বরে কথা বলছে!

: এরা বোধহয় শিক্ষিত, বিলেত ফেরত।

: গাধা, ভূত আবার বিলেত যেতে পারে নাকি!

: কেন বিলেতে কী ভূত নেই!

: আছে আছে, শুনেছি একটা ভূত কেমব্রিজে পড়ত। পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিল।

: কেমব্রিজটা যেন কোথায়? ইউরোপ না আমেরিকায়?

ওরা পরস্পরের দিকে তাকালো।

তমাল ফস করে বলল,

: ঢাকার উত্তরায়।

: আরে গাধা, ওটা না, ওটা না। ওমন তো অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলও আছে।

ওরা হাসতে গিয়ে সামলে নিল। কিন্তু কেমব্রিজ কোথায় ঠিকঠাক মনে করতে না পেরে আয়েশার খুব খারাপ লাগতে লাগল।

ওরা বোধহয় ফিসফাস একটু বেশি করে ফেলেছিল। লোকগুলোর একজন খানিকটা এগিয়ে এল।

: চুপ, চুপ।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে আবার ফিলে গেল। ওরা গল্পগুজব করছে। গাছকাটা চলছে। খুট করে কোনো শব্দ হলেও ওরা এদিক-ওদিক দেখছে।

একজন বলল,

: আরে না, অত ভেবো না। ভূতের ভয়ে এদিকে কেউ আসে না। এখানে ভূত আছে এই রটনাটা খুব কাজে লেগেছে।

ওরা প্রাণখুলে হাসে। তখনই একটা দমকা বাতাস আসে। বাতাসে উড়ে যায় একজনের মাথার হ্যাট। তীব্র আলোয় পুরো চেহারা দেখতে পায় তিনজনই।

আয়েশা চেঁচিয়ে উঠল,

: ওরা ভূত না, মানুষ।

: কে কথা বলল? কে? কে? ধর ধর।

ওরা খুঁজতে লাগল চারদিকে।

তমাল বলল,

: দৌড়া। ধরা পড়লে চলবে না।

ওরা দৌড়াচ্ছে, পেছনে বনজঙ্গল ভেঙে দৌড়াচ্ছে ভূতরূপী মানুষেরা। দৌড়াতে দৌড়াতে ওরা বেরিয়ে আসে জঙ্গল থেকে, পানি খোঁজে। পানি নেই। পড়ে গেছে কোথায় যেন। সন্ধ্যা নেমেছে আগেই। ওরা লম্বা হয়ে ঘাসের উপর শুয়ে হা করে নিশ্বাস নেয়। দু'হাতে খামচে ধরে শিশিরভেজা ঘাস। ঘাসই যেন ওদের পিপাসা মেটায়। আকাশে চাঁদ নেই। ঘোর অমাবস্যা। কিন্তু কেটে গেছে ওদের মনের অন্ধকার, ভয়ভীতি। ওরা জেনে গেছে ভূত বলে কিছু নেই। আছে বনদস্যু কাঠুরের বেশে। এবার ওরা যাবে পুলিশের কাছে। সবার অলক্ষ্যে আয়েশা তুলেছে কয়েকটা ছবি। সেগুলো আছে ওর প্যান্টের পকেটে, মোবাইলে। ভাজ্ঞিস আলোটা ছিল! ❑

কথাশিল্পী, গবেষক



নজরুলের ভাবনায় ভূত

পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য

তমালিকা

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) জাতীয় প্রেরণা ও জাগরণের অগ্রপথিক। তাঁর চেতনায় মিশে আছে সোঁদা মাটির গন্ধ, ফুল ও ফলের স্বপ্ন। এই স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়েই মানবজাতির মননের বিকাশ প্রবাহিত হয়। নজরুলের বহুমাত্রিক সৃজনের অমৃত উপহার সমাজ পেয়েছে। আজকের শিশু-কিশোর আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাঁর দর্শন সামগ্রিকভাবে শিশু-কিশোরদের জন্য অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। নজরুলের বিচিত্র ভাবনার মধ্যে ভূত প্রসঙ্গের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায়।

নজরুলের প্রতিটি রচনার মধ্যে এক একটি বৈচিত্র্যময় কাহিনি খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর রচনায় ভূত-অদ্ভুতরূপে ধরা দেয়। শিশু-কিশোরদের মাঝে ভূত শব্দটি এক কৌতুহল সৃষ্টি করে। কেউ কেউ ভূতের গল্প শুনে খুব মজা পায়। আবার কেউ কেউ খুব ভয়ও পায়। নজরুলের রচনায় ভূতের উপদ্রব কোনো ভয়ের বিষয়ে চিত্রিত হয়নি। তাঁর রচনায় ভূত রূপক অর্থে, কৌতুকের ছলে এবং ব্যাঙ্গাত্মকভাবে অর্থাৎ অদ্ভুতভাবে চিত্রিত হয়েছে। নজরুলের রচনায় ভূত প্রসঙ্গে অলৌকিক বিষয় প্রাধান্য না পেলেও 'ভূতুড়ে' অথবা আধিভৌতিক শব্দকল্পের ব্যবহার রয়েছে। তিনি মূলত ভূত বলতে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ভয় বা সামাজিক কুসসংস্কারকে চিত্রিত করেছেন।

নজরুল রচিত 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থে 'ভূত-বাগানের গান' (বাউলের গান) শিরোনামে একটি ভূতের ওপর গান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেখানে রূপক অর্থে সমাজ বা দেশের ভূত তাড়ানোর কথা চিত্রিত হয়েছে। উল্লিখিত গানটির রচনাকাল সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১৬ই শ্রাবণ 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত হয়।

নজরুলের সৃষ্টি 'ভূত-বাগানের গান' (বাউলের গান) বিশ্লেষণ করে যা পাওয়া যায়– ত্রেত্রিশ কোটি দেবতাকে ভূতে সবসময় নাচাচ্ছে বলে একটা শ্রেণি মনে করে। সেই শ্রেণিটাই দেবালয়ে গিয়েও ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোষ্ঠী ভূতের ভয় দূর করার জন্য ওঝার শরণাপন্ন হচ্ছে। কার্যকলাপে মনে হয় ওঝাকেও ভূতে পেয়েছে। অনেকে সরিষা পোড়া দিলে ভূত তাড়ানো যায় মনে করে। মন থেকে না সরলে ভূত তাড়ানো যায় না। ওঝারাও কিন্তু কুসংস্কার মুক্ত নয়। অবিশ্বাস্যভাবে চোখে পড়ে প্রতিনিয়ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষেরা সেই সব ওঝাদেরই পিছনে ছুটছে। কি অদ্ভুত না! মনকে শক্ত না করলে কোনোদিন ভূত দূর হবে না। আর মন থেকে ভূত দূর না হলে দেবালয়ে গিয়েও কোনো লাভ নেই।

কবির 'ভূত-বাগানের গান' (বাউলের গান)-এর বাণী–

ওই তেত্রিশ কোটি দেবতারে তোর তেত্রিশ কোটি ভূতে
আজ নাচ্ বুঢ়টি নাচায় বাবা উঠ্‌তে বস্‌তে শুতে !
ও ভূত যেই দেখছে মন্দির তোর
নাই দেবতা নাচ্‌ছে ইতর,
আর মন্ত্র শুধু দন্ত বিকাশ, অমনি ভূতের পুতে
তোর ভগবানকে ভূত বানালে ঘানি-চক্রে জু'তে ॥
ও ভূত যেই জেনেছে তোদের ওঝা
আজ নকলের বইছে বোঝা,
ওরে অম্‌নি সোজা তোদের কাঁধে খুঁটো তাদের পুঁতে,
আজ ভূত-ভাগানোর মজা দেখায় বোম্-ভোলা বম্বুতে!
ও ভূত সর্ষে-পড়া অনেক ধুনো
দেখে শু'নে হ'ল ঝুনো,
তাই তুলো-ধুনো করছে ততই যতই মরিস কুঁথে,
ও ভূত নাচ্ছে রে তোর নাকের ডগায় পারিসনে তুই ছুঁতে!
আগে বোঝেনি ক' তোদের ওঝা
তোরা গোঁজামিলের মন্ত্র-ভজা।
(শিখলি শুধু চক্ষু-বোঁজা)
শিখলি শুধু কানার বোঝা কুঁজোর ঘারে থুঁতে,
তাই আপনাকে তুই হেলা ক'রে ডাকিস স্বর্গ-দূতে ॥
ওওে জীবন-হারা, ভূতে-খাওয়া !

ভূতের হাতে মুক্তি পাওয়া
সে কি সোজা?-ভূত কি ভাগে ফুস-মন্তর ফুঁতে?
তোরা ফাঁকির কিস্তু এড়িয়ে-পড়বি কুল-হারা 'কিন্তু'তে!
ওরে ভূত তো ভূত-ঐ মারের চোটে
ভূতের বাবা উধাও ছোটে !
ভূতের বাপ ঐ ভয়টাকে মার্, ভূত যাবে তোর ছুটে।
তখন ভূতে-পাওয়া এই দেশই ফের ভরবে দেবতা দূতে ॥

নজরুল ভূত বিশ্বাস করতেন না। তাঁর সৃষ্টিতে ভূত মূলত এসেছে গ্রামীণ কুসংস্কার ও অজ্ঞতাকে তুলে ধরার জন্য। নজরুল 'ভূতের ভয়' শিরোনামে একটি নাটক রচনা করেন। উল্লিখিত নাটকটিতে কবি 'দেবাধিপতি' চরিত্রটির ব্যাখ্যায় প্রকাশ করেছেন অস্ত্রধারীর বিপক্ষে অস্ত্রধরা যায়। কিন্তু ভূত দূর করতে হলে মাভৈঃ-বাণীর ভরসা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কবি বলেছেন– 'শূন্যের সাথে যুদ্ধ করি কি দিয়ে? এরা শাসন করছে ভয় দিয়ে-অস্ত্র দিয়ে ত নয়। অস্ত্রধারীর বিপক্ষে অস্ত্র ধরা যায়-কিন্তু ভয় দেখানো ভূতের উপদ্রব হতে রক্ষা পেতে হলে মাভৈঃ-বাণীর ভরসা ছাড়া উপায় নেই।'

কাজী নজরুলের সাহিত্য কর্ম কুসংস্কার ও অজ্ঞতাকে ঘুচিয়ে দিয়ে আলোর পথ দেখায়। শিশু-কিশোরদের ভূতের ভয় দূর করার জন্য নজরুল সাহিত্য পাঠ করার বিশেষভাবে প্রয়োজন রয়েছে। ❑

লেখক ও নজরুল গবেষক

তথ্যঋণ :

১. *কাজী নজরুল ইসলাম. নজরুলের কবিতা সমগ্র, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর, পৃ. ১৩৩-১৩৪*

২. *কাজী নজরুল ইসলাম. নজরুলসমগ্র, (নাটক ও নটিকা), চর্তুদশ খণ্ড, সম্পাদনা, জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, প্রকাশকাল, জুন ২০১৮, পৃ. ৪৭*

ভূতের কবলে

ডা. হারুন-অর-রশিদ

একদিন শীতের বিকেলে
আমরা সবাই মিলে
মজার খেলায় হাসিতে মেতে
গেলাম কাছের জঙ্গলে।

কখন যে সন্ধ্যা হলো
চারদিক হলো কালো
আমি ডাকলাম জোরে তাদের
ঐ যে দূরে জ্বলছে, ও কিসের আলো?

শীতে কাতর সবাই আমরা
ছুটলাম ওদিকে
ওখানে গিয়ে দেখি কটা ভূত
তাকিয়ে এদিকে।

মামদো ভূত, শেওড়া ভূত
আরও কত নাম না জানা ভূত
চোখ লাল করে শিং উচিয়ে
তাকালো করে চোখ কুতকুত।

ভাবলাম এই বুঝি সাঙ্গ হবে
মোদের কচি জীবন
বললাম, সর পোয়াই আগুন
সাহস করে বেঁধে মন।

জানতাম না পোয়াই ছিল
ভূতদের নেতার নাম
ভূতেরাই পেল যে ভয়
ভাবল বিধি বাম।

বলল তারা, অনুনয় করে
আমাদের মেরো না ভাই
তোমায় আমরা মানব রাজা
আমরা হবো প্রজা।



নিজ গাঁয়ের ভূত

আহমেদ টিকু

সে অনেক দিন আগের কথা। আমার দাদা শুনেছিলেন তার দাদার কাছ থেকে । তাহলে বুঝতেই পারছ ঘটনাটা কতকাল আগের। সে সময় এখনকার মতো এত মানুষজন ছিল না। মানুষের বসতও ছিল

অনেক দূরে দূরে। গ্রামগুলো ছিল অনেক বড়ো বড়ো গাছপালা আর ঝোপঝাড়ে ঠাসা। রাত তো দূরে থাক – দিনেই অনেক জায়গা রাতের মতো ঘুটঘুটে আঁধার হয়ে থাকত। আর ওসব নির্জন আঁধার বন-ঝোপে ভূত-প্রেতেরা পরম আনন্দে হই-হল্লা করে বসবাস করত। সেই সময় একটা লোক হাট থেকে বাড়ি ফিরছিল। দূরের পথ ফিরতে রাত নেমে এল। পথের দু'পাশে ঘন জঙ্গল। অনবরত ঝিঁঝি ডাকছে। ডানা ঝাঁপটে নিশাচর পাখি এ গাছ থেকে ও গাছে উড়ে যাচ্ছে। দূরে শেয়াল ডাকছে।

আগে-পিছে বহুদূর পর্যন্ত জনবসতি নেই। লোকটার হাতে ছিল ইলশে মাছ। রাতে ইলশে মাছ দেখলে নাকি ভূত পিছু নেয়। এটা শুনেছিল সে মুরুব্বিদের মুখ থেকে। সে কথা এখন তার মনে পড়তে ভয়ে আত্মা দেহছাড়া হবার উপক্রম। তবু মনে সাহস এনে লোকটা একমনে কোনোদিকে না তাকিয়ে হেঁটে চলছে। হঠাৎ মনে হলো তার পিছে কে যেন হাঁটছে। ও ঘুরে তাকালো। তাকিয়ে যা দেখল তাতে ওর ভয়ে হাত-পা দেহের ভিতর ঢুকে যাবার মতো অবস্থা। ভয়ংকর চেহারার দুটো ভূত তার পিছু নিয়েছে। মূলোর মতো তাদের দাঁত, আগুনের ভাটার মতো চোখ, কুলার মতো জিহ্বা আর ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। লোকটা পিছে তাকাতেই ভূত দুটো নাকিসুরে বলে ওঠে– 'এ্যাঁই, মাঁছ দেঁ..এঁ ..এঁ..এঁ। লোকটা ভয়ের চোটে দাঁত কপাটি লাগার জোগাড়। তবু মনে মনে সাহস এনে ভাবল– মরতে যদি হয় মরব। তবে শেষবারের মতো একটু বাঁচার চেষ্টা করতে দোষ কি?

লোকটা ভয় না পাবার ভান করে বলল, 'ও তোমরা মাছ খাবে, আচ্ছা খেও। কিন্তু আমাকে নিজ গাঁ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে তারপর এই মাছটা খেও কেমন?'

ভূতরা সমস্বরে বলল, 'এঁই কঁথা তঁবে চঁল।'

লোকটা আগে হাঁটে আর ভূতরা হাঁটে পিছে। এভাবে বহু পথ হেঁটে লোকটা নিজ গাঁয়ের সীমানায় পৌঁছে গেল। তখন ভূতরা বলল, 'এ্যাঁই দেঁ... মাঁছ দেঁ।' লোকটা বলল, 'আর একটু চলো না ভায়ারা, ওই বড়ো বটগাছটার তলায় বড্ড ভয় পাই। আমাকে ওটা পার করে দিয়ে এসো না ভাই।'

– 'তোঁকে নিঁয়ে আঁর পাঁরি নাঁ। চঁল জঁলদি চঁল।'

ওই বড়ো বটগাছটায় এক ভূত আর পেতনির ছানা-পোনারা যুগযুগ ধরে বসবাস করত। রাতে তো তারা অনেক কাজ করত। কখনও কখনও পেতনিটা নির্জন দুপুরে গাছের মগডালে শুয়ে চুল শুকাতে দিত। সেই চুল মগডাল থেকে মাটি পর্যন্ত ঝুলে বটের ঝুরির মতো দুলত। তাই দিনে বা রাতে কেউ পারতপক্ষে এমুখো হতো না।

নিজ গাঁয়ে পৌঁছে লোকটার সাহস অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। তার বুদ্ধিও একটু কাজ করতে শুরু করল। সে এক কূটচাল চালল। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো সে ভূত দিয়ে ভূত শায়েস্তা করতে চাইল।

বটগাছটার তলায় গিয়ে সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে বলতে শুরু করল– 'এই গাঁয়ের ভূতদের কী হয়েছে? তারা কোথায়? তারা থাকতে ভিন গাঁয়ের ভূতরা আমার ইলশে মাছ খেয়ে যাবে?'

বটগাছের ভূত-পেতনি ও তার ছানা-পোনারা আগে থেকেই ইলিশ মাছের ঘ্রাণ পেয়েছিল। ওরা এটা নিয়েই আলোচনা করছিল। লোকটার কথা শুনে ওরা বটগাছে ঝড় তুলে নিচে নেমে এল। ভিন গাঁয়ের ভূত দুটোকে দেখে প্রচণ্ড রাগে বলতে শুরু করে– 'কিঁরে তোঁরা আঁবার এঁ তঁল্লাটে এঁসেছিস? তোঁদের আঁজ দঁফারফা কঁরে ছাঁড়ব।'

ভিনগাঁর ভূত দুটোও ছাড়বার পাত্র নয়। ওরাও জোর দিয়ে বলে, 'মাঁছের জঁন্যই লোঁকটাকে আঁমরা এঁতদূর এঁগিয়ে এঁনেছি। এঁ মাঁছ আঁমাদের।'

পেতনিটা রেগে কাঁই হয়ে বলে, 'দাঁড়া তোঁদের দেঁখাচ্ছি, জঁম্মের মঁতো মাঁছ খাঁওয়াচ্ছি।'

বলেই উভয়পক্ষ তুমুল মারামারিতে লিপ্ত হলো। মনে হলো বটগাছতলায় মহাতাণ্ডব শুরু হয়েছে। এ সুযোগে লোকটা সুরুৎ করে মাছ নিয়ে বাড়ি পৌঁছে গেল। বউকে ডেকে মাছ কেঁটে-কুটে রান্না করে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তৃপ্তির সাথে খেলো। ❑

শিক্ষক ও শিশুসাহিত্যিক



ভূত্র

জসীম আল ফাহিম

রাতদুপুরে সলিম আলি সাহেবের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম থেকে জেগে তিনি একেবারে 'থ' হয়ে গেলেন। এ কী দেখছেন তিনি! সলিম আলি সাহেব সবসময় ডান কাত হয়ে বিছানায় ঘুমায়। কিন্তু আজ তিনি বাম কাত হয়ে শুয়েছিলেন। বাম কাত হয়ে সচরাচর তিনি ঘুমান না। বাম কাত হয়ে শুয়ে থাকলে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয় না। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াও ঠিকমতো চলে না। ঘুম ভাঙার পর সলিম সাহেব দেখলেন, আচানক ব্যাপার! তিনি শূন্যে ভাসছেন। খাটের ওপর থেকে প্রায় পাঁচ ফুট উপরে তিনি শূন্যে ভাসছেন। কীভাবে এটি সম্ভব হলো! এভাবে তিনি শূন্যে ভাসছেনই বা কেন? বিষয়টি কিছুতেই তার মাথায় ঢুকল না।

সলিম সাহেব শূন্যে এপাশ ওপাশ হলেন। গড়াগড়ি খেলেন। উপুড় হলেন। চিৎ হলেন। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার! শূন্য থেকে তিনি পড়ছেন না। খাটের ওপর থেকে নামতে পারছেন না। অনেকক্ষণ চেষ্টা

করে সলিম সাহেব শেষে নিচে নামার আশা ছেড়েই দিলেন। ব্যাকুল হয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন, এখন কী করা! এই যে আমি শূন্যে ভেসে রয়েছি, এখন নামব কেমন করে?

ভাবতে ভাবতে সলিম সাহেব কেমন যেন অসহায় বোধ করলেন। দেখে মনে হলো, তিনি ভীষণ ভয় পাচ্ছেন। অতিমাত্রায় ভয় পাওয়ার জন্য তার প্রেসার হাই হয়ে গেছে। তিনি দরদর করে ঘামছেন।

শূন্যে ভেসে থেকে সলিম সাহেবের অবস্থা যখন একেবারে কেরোসিন। এমন সময় তিনি কিছু একটা ফিসফিসানি আওয়াজ শুনতে পেলেন। কেউ একজন যেন তার কানে মুখ রেখে ফিসফিস করে বলছে, স্যার কি খুব ভয় পেয়েছেন?

সলিম সাহেব নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, না। ভয় পাবো কেন? ভয় পাওয়ার কী আছে। আমি শূন্য থেকে খাটের ওপর নামতে পারছি না, এই একটু সমস্যা।

অদৃশ্য কণ্ঠ বলল, ভয় পাচ্ছেন না যখন বলছেন–তাহলে এক কাজ করি। আপনার শরীর ধরে ঝাঁকি দেই। আপনাকে শূন্যে ছুড়ে মারি, কী বলেন?

শূন্যে ছুড়ে মারার কথা শুনে সলিম সাহেবের হালে যেন পানি নেই। তিনি কাকুতি মিনতি করে বললেন, আরে না না। করো কী করো কী তুমি? ভুলেও ঝাঁকি দিও না কিন্তু। আমাকে শূন্যে ছুড়ে মারলে তো আমি নির্ঘাত হার্টফেল করব। হার্টফেল করে মারা যাব। আমাকে তুমি মেরো না, প্লিজ!

অদৃশ্য কণ্ঠ বলল, কিন্তু আপনি তো অন্যকে ইচ্ছেমতো মারেন। মেরে আনন্দ পান।

সলিম সাহেব অত্যন্ত করুণ গলায় বললেন, আমি আসলে আমার ছাত্রদের মারি। ছাত্রদের মাঝেমধ্যে মারতে হয়। না মারলে এরা মানুষ হয় না। শয়তান হয়ে যায়।

অদৃশ্য কণ্ঠ বলল, আপনার ছাত্ররা তো সবাই কোমলমতি। আদম সন্তান। আদম সন্তান কখনো শয়তান হতে তো শুনিনি। একবার শয়তান হয়েছিল ইবলিশ নামক জনৈক জিন। আপনি তো দেখি ভারি মিথ্যে কথা বলেন। মিথ্যে বলা মহাপাপ, জানেন না?

সলিম সাহেব বুঝতে পারলেন, অদৃশ্য কণ্ঠের কাছে তিনি ধরা পড়ে গেছেন। ধরা পড়ে যাওয়া মানে মহাবিপদ। এমন বিপদে তিনি জীবনে পড়েননি। সলিম সাহেব ধনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণিত শিক্ষক। ক্লাসের বাইরে তিনি টাকার বিনিময়ে ছাত্রদের প্রাইভেট পড়ান। এসব নিয়ে অভিভাবক মহলে তার বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ। তিনি নাকি কৌশলে ছাত্রদের প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করেন। ক্লাসে তার পড়া ঠিকমতো দিতে না পারলে কঠিন শাস্তির বিধান। শাস্তিস্বরূপ গতকাল তিনি ভূত্রকে খুব মারধোর করলেন। ভূত্র পঞ্চম শ্রেণির দুরন্ত এক কিশোর। সলিম সাহেব তাকে ভূতু বলে ডাকেন। এটা নিয়ে ভূত্রের বড়ো আপত্তি। কিন্তু তিনি তা শোনেন না।

অদৃশ্য কণ্ঠের জবাবে সলিম সাহেব বললেন, ভুল হয়ে গেছে। কী বলতে কী বলে ফেলেছি। আমায় মাফ করে দাও।

অদৃশ্য কণ্ঠ বলল, মাফ করার আগে আপনাকে কথা দিতে হবে ছাত্রদের সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করবেন না।

সলিম সাহেব বললেন, ছাত্রদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে করতে এটা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। অনেক দিনের পুরনো অভ্যাস। তবু কথা দিচ্ছি, অভ্যাসটা আমি পালটাবো।

অদৃশ্য কণ্ঠ বলল, বলুন, ছাত্রদের গায়ে কখনো আর হাত তুলবেন না।

সলিম সাহেব তোতাপাখির মতো বললেন, ছাত্রদের আর কখনো আমি মারব না।

অদৃশ্য কণ্ঠ বলল, বলুন, ক্লাসে ফাঁকি দিবেন না। ক্লাসের বাইরে ছাত্রদের কখনো প্রাইভেটও পড়াবেন না।

সলিম সাহেব বললেন, হ্যাঁ ক্লাসে ফাঁকি দিব না। ছাত্রদের প্রাইভেটও পড়াবো না।

অদৃশ্য কণ্ঠ বলল, বলুন। কখনো ছাত্রদের নাম

ভেংচিয়ে ডাকবেন না।

সলিম সাহেব বললেন, আর কোনোদিন ছাত্রদের আমি নাম ভেংচিয়ে ডাকব না।

সলিম সাহেবের কথাগুলো শুনে মনে হলো অদৃশ্য কণ্ঠ খুশি হয়েছে। পরে বলল, কথাগুলো ঠিক ঠিক আপনার মনে থাকবে তো? নাকি আবার ভুলে যাবেন? ভুলে গেলে কিন্তু পুনরায় এমন কাজ করা ছাড়া আমার আর গতি নেই।



সলিম সাহেব বললেন, নিশ্চয়ই মনে থাকবে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মনে থাকবে। এই কথা আমি কখনো ভুলব না।

অদৃশ্য কণ্ঠটা সলিম সাহেবের কাছে কেমন যেন চেনা চেনা মনে হলো। সন্দেহ দূর করার জন্য তিনি সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে বাবা? তোমার কণ্ঠটা আমার কাছে বড়ো চেনা মনে হচ্ছে। আমি তোমাকে দেখছি না কেন বাবা?

অদৃশ্য কণ্ঠ বলল, দেখবেন কেমন করে? আমি এখন মানুষের বেশে নেই। তাছাড়া আমি তো আর মানবসন্তান নই, যে আপনি আমাকে দেখতে পাবেন।

সলিম সাহেব কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন, মানুষ নয় বলছ–তাহলে তুমি কী? ভূত-প্রেত?

অদৃশ্য কণ্ঠ বলল, হ্যাঁ ভূত-প্রেত। আমার মা ভূত! বাবাও ভূত! আমি হলাম মা-বাবার একমাত্র সন্তান। ভূতের পুত্র। ভূতের 'ভূ' আর পুত্রের 'ত্র' মিলে হলো ভূত্র। স্যার আমি আপনার ছাত্র–ভূত্র।

'ভূত্র' কথাটি শোনামাত্র সলিম সাহেবের তো কান খাড়া। দু-চোখ ছানাবড়া। পড়া না পারার অজুহাতে তিনি গতকাল তাকে উত্তম মধ্যম দিয়েছিলেন। কিন্তু সে যে ভূতের পুত্র এই কথা তো তার জানা থাকার কথা নয়। জানলে কী আর তিনি ভূতের পুত্রের গায়ে হাত তোলেন নাকি? তিনি মনে মনে ভাবেন, ভারি আশ্চর্য তো! এতদিন ধরে একটা ভূতের পুত্র আমাদের স্কুলে পড়াশোনা করছে। অথচ আমরা কেউ ব্যাপারটা বুঝতেই পারলাম না। ❑

সেকশন অফিসার, ট্রাস্টি বোর্ড, লিডিং ইউনিভার্সিটি, সিলেট

লাজুক ভূত

মো. আবুল কালাম

এই ভূতটা খুব লাজুক,
কথা বললে থাকে চুপ
আড়ালে থাকে, সামনে আসে না,
হঠাৎ দেখলে নিজেই হাসে না।

সে ভয় দেখাতে জানে না,
কারো দিকে তাকায় না।
শিশু দেখলে লুকায় যে,
পাতার আড়াল খোঁজে সে।

তার মনটা খুব ভালো,
অন্ধকার নয় চায় সে আলো
রাতে সে তারা গোনে,
চাঁদের বুড়ি তা শোনে।

মধ্যরাতের অতিথি

মোশারফ হোসেন

মধ্যরাতে দরজায় টোকা!
কে এল এই নিঃশব্দ ঘরে?
জানালা খুলে তাকাই বাইরে
কুয়াশা ভেসে আসে ধীরে ধীরে।

হাওয়ায় ভাসে শীতল ছোঁয়া
মনে হয় ভেসে আসছে ধোঁয়া
হঠাৎ দেখি সাদা এক অবয়ব
চোখ তার সাদা ধবধব।

মাটির উপর পা রাখে না,
তবু সে সরে যায় না।
নরম কণ্ঠে ডাকে আমায়,
কী যেন বলতে চায়।



শারিকা তাসনিম নিধি, সপ্তম শ্রেণি, হাজীগঞ্জ পাইলট বালিক উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর

ছড়া কবিতায় ভূতের জগৎ

মো. ইকবাল হোসেন

বাংলা সাহিত্য মানেই গল্প, কবিতা আর ছড়ার রঙিন এক ভুবন। আর এর বিশেষ আকর্ষণ হলো ভূত নিয়ে লেখা ছড়া ও কবিতা। ছোটোবেলা থেকে আমরা দাদা-দাদি ও নানা-নানির কাছ থেকে মজার মজার ভূতের গল্প শুনে কখনো ভয় পেয়ে, কখনো আবার হেসে গড়াগড়ি খেয়েছি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, ছড়া-কবিতায় ভূত সবসময় ভয়ংকর নয়; বরং অনেক সময় তারা হাস্যকর, দুষ্টু, অলস কিংবা বোকাসোকা চরিত্রে হাজির হয়। তাই ভূত নিয়ে ছড়া-কবিতা শিশু-কিশোরদের মনে এক অন্যরকম আনন্দ দেয়। বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের লেখায়ও ভূত এসেছে নানা মাত্রায়, নানান অভিজ্ঞতায়।

বাংলা সাহিত্যে ভূতের উপস্থিতি নতুন কিছু নয়। উপকথা, রূপকথা ও লোকগল্পে বহুদিন ধরেই ভূতের গল্প প্রচলিত। বিশেষ করে গ্রামে সন্ধ্যার পর দাদু-নানুর মুখে ভূতের গল্প শোনার স্মৃতি অনেকের মনেই গেঁথে আছে। তালগাছ, শ্মশান, বটগাছ, নির্জন পুকুর, দিঘিরপাড়–এসব জায়গাকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে অসংখ্য ভূতের কাহিনি। আবার যখন সেই ভূত ছড়া-কবিতায় আসে, তখন তার রূপ বদলে যায়। সে আর কেবল ভয় দেখায় না, বরং নানা মজার কাণ্ড করে পাঠককে হাসায়।

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক সুকুমার রায় তাঁর অদ্ভুত ও কৌতুকপূর্ণ রচনায় এমন সব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যা বাস্তব নয়, তবু আমাদের খুব আপন মনে হয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আবোল তাবোল-এ আমরা নানা উদ্ভট প্রাণী ও অদ্ভুত চরিত্রের দেখা পাই। যদিও সরাসরি ভূত নয়, তবুও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মধ্যে এমন এক অদ্ভুত বিষয় রয়েছে, যা ভূতের মজার জগতের সঙ্গে মিলে যায়। তাঁর লেখনী আমাদের শিখিয়েছে, ভয়ের মধ্যেও হাসি লুকিয়ে থাকতে পারে।

ভূত নিয়ে ছড়া-কবিতার একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো এর ছন্দ ও শব্দের খেলা। ছোটো ছোটো লাইন, সহজ শব্দ, আর মজার মিল-এসব মিলিয়ে তৈরি হয় এমন এক রচনা। যেমন–

ভূত আসে রাতের বেলা,
খায় না ভাত, খায় শুধু মেলা।

এ ধরনের ছড়ায় ভয়ের বদলে কৌতুকের ছোঁয়া বেশি থাকে। ফলে শিশুরা ভূতকে ভয় না পেয়ে বন্ধুর মতো ভাবতে শেখে।

গ্রামীণ লোকছড়ায় ভূতকে কখনও দেখা যায় তালগাছে উলটো হয়ে ঝুলতে, কখনো বা খালি পায়ে হাঁটতে। কিন্তু সেই ভূত আবার চায় মিষ্টি খেতে, কিংবা ভয় পায় বজ্রপাতকে! এই রকম চিত্র ছড়াকে করে তোলে আকর্ষণীয়। শিশু-কিশোরদের কল্পনাশক্তি বিকাশে এসব ছড়ার ভূমিকা অপরিসীম। কারণ তারা বুঝতে শেখে-সব ভূতই ভয়ংকর নয়; কিছু ভূত খুবই হাস্যকর।

ভূত নিয়ে ছড়া-কবিতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নৈতিক শিক্ষা। অনেক সময় দেখা যায়, দুষ্টু ছেলে বা মিথ্যা বলা শিশুকে শিক্ষা দিতে ছড়ায় ভূতের ব্যবহার করা হয়। তবে সেটি ভয় দেখিয়ে নয়, বরং হাসির মাধ্যমে। যেমন–একটি ছড়ায় দেখা গেল, এক অলস ভূত সারাদিন ঘুমায়, কাজ করতে চায় না। শেষে সে ক্ষুধায় কষ্ট পায়। এই গল্পের



মাধ্যমে শিশু বুঝতে পারে-অলসতা ভালো নয়।

এখনকার আধুনিক সময়েও ভূত নিয়ে কবিতা, গল্প ও উপন্যাস লেখা হচ্ছে। টেলিভিশন, কার্টুন ও গল্পের বইয়ে নানা রকম ভূতের চরিত্র দেখা যায়। তবে আগের মতো ভয়ংকর নয়, বরং বন্ধুসুলভ ও মজার। এর ফলে শিশুদের মনে ভয় তৈরি না হয়ে বরং আনন্দের অনুভূতি জন্মায়।

ভূত নিয়ে ছড়া-কবিতা আমাদের সংস্কৃতির একটি অংশ। এটি শুধু বিনোদন নয়, বরং কল্পনাশক্তি ও ভাষাবোধ উন্নত করার একটি মাধ্যম। ছড়ার সহজ ছন্দ শিশুদের শব্দ শেখায়, মিল খুঁজে পেতে সাহায্য করে এবং ভাষার প্রতি আগ্রহ বাড়ায়। একই সঙ্গে ভূতের মজার চরিত্র তাদের মনে সাহস জোগায়-অন্ধকারকে ভয় না পেয়ে কৌতূহল নিয়ে দেখতে শেখায়।

আমাদের গ্রামীণ জীবনে বিদ্যুৎ না থাকায় একসময় রাত ছিল গভীর ও নীরব। সেই অন্ধকারে নানা শব্দকে ঘিরে তৈরি হতো ভূতের ভাবনা। কিন্তু সেই ভাবনাই ছড়া ও কবিতায় রূপ নিয়ে হাসির খোরাক জুগিয়েছে। ফলে ভয়ের গল্পও হয়ে উঠেছে আনন্দের উপকরণ।

শিশুসাহিত্যে ভূতের ব্যবহার আসলে এক সৃজনশীল কৌশল। এটি শিশুদের মনে ভয়ের অনুভূতিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে শেখায়। যখন তারা দেখে, ভূতও ভুল করে, ভূতও পড়ে যায়, ভূতও কাঁদে-তখন তারা বুঝতে পারে, ভয়ের বিষয়ও হাস্যকর হতে পারে। এভাবেই ছড়া-কবিতা তাদের মানসিক বিকাশে সহায়তা করে।

সবশেষে বলা যায়, ভূত নিয়ে ছড়া-কবিতা বাংলা সাহিত্যের এক মজার ও প্রাণবন্ত অধ্যায়। এটি আমাদের শৈশবের স্মৃতিকে রঙিন করে তোলে, হাসির ঝরনা বইয়ে দেয় এবং ভাষার প্রতি ভালোবাসা জাগায়। ভয়ের আবরণে মোড়া এই ভূতেরা আসলে আমাদের আনন্দের সাথি। তাই ছড়া-কবিতায় ভূতের উপস্থিতি কখনও কমবে না; বরং নতুন নতুন রূপে তারা বারবার ফিরে আসবে শিশুদের কল্পনার জগতে। ভূত মানেই শুধু অন্ধকার নয়-ভূত মানেই ছড়ায় হাসি, কবিতায় মজা আর কল্পনার ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো এক অদ্ভুত আনন্দলোক। ❑





মনের ভূত

সালাহ উদ্দিন আহমেদ মিন্টু

ভূতের গল্পের আবেদন চিরন্তন। রোমাঞ্চিত হতে, ভয় পেতে, শিহরিত হতে সব বয়সের মানুষই ভালোবাসে। দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ করে শিশুদের গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ খুঁজে পাবার রসদ ভূতের গল্পে ভরপুর। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার আর কুসংস্কার সবই আছে ভূতের গল্পে। আশ্চর্যের বিষয় পৃথিবীতে ভূত বিশ্বাস করে যত লোক, অবিশ্বাসীদের সংখ্যা তার চেয়ে কম নয়। যারা অবিশ্বাসী তারা বলেন ভূত বলে কিছু নেই। এ শুধু চোখের আর মনের ভুল। আর বিশ্বাসীরা বলেন, ভূত চোখের বা মনের ভুল কখনই হতে পারে না। এ তর্কের কোনো শেষ নেই। মীমাংসাও নেই। তবে আজ আমি আমার নিজের একটি ঘটনার কথা বলছি।

একদিনের ঘটনা। জ্যোৎস্না রাত। সময় হয়ত ৮টা হবে। মসজিদে আরবি পড়া শেষ করে বাড়ি ফিরছিলাম। মসজিদ থেকে বাড়ি ২ মিনিটের হাঁটা পথ। হঠাৎ চোখে পড়ল অনেক লম্বা বা উঁচু একটা কিছু, লম্বা লম্বা আঙুল, অনেক বড়ো হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে ইশারা দিয়ে যেন বলছে 'কাছে এসো না'। এটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে গেলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম ভূত নয়তো! নানি-দাদিমার কাছে অনেক ভূতের গল্প শুনেছি। তখন ভয়ে দাদি-নানিমার গা ঘেঁষাঘেঁষি করে জড়ো হয়ে বসে বা শুয়ে থাকতাম। গা ছমছম পরিবেশে শিহরণ জাগানো শরীরে এক মনেই শুনতাম। তাহলে এই কি সেই ভূত? ভয়ে সারা শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে। আশপাশে কেউ নেই যে ডেকে সাহায্য চাইব। বিপদের সময়ের দোয়া 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সোবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জোয়ালেমিন'- শিখেছিলাম বলে ওই মুহূর্তে বার বার পড়ছিলাম। কিন্তু না, কিছুতেই ভূত পিছু হটছে না। বরং আগের মতোই সামনে না যাওয়ার ইশারা দিচ্ছে। অসহায়ের মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়েই রইলাম। ভয়ে কান্নাও আসছিল এই বুঝি জীবন শেষ। থরথর করে কাঁপতে থাকি। লক্ষ্য করলাম শরীর থেকে ঘাম বেরুচ্ছে। এমন সময় পেছন থেকে কেউ ডেকে উঠল 'কীরে মিন্টু, এখানে একা একা দাঁড়িয়ে কী করছিস'? আমি ডাক শুনে পেছন ফিরে দেখি আমার মেজো কাকু। তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলাম। আমার গায়ে হাত রেখে কাকু জিজ্ঞেস করে 'কী হয়েছে, কাঁদছিস কেন?' সেই মূহুর্তে কাকুর প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারিনি। ভয়ে ভয়ে ভূত বলে চিৎকার দিয়ে পিছনে হাত বাড়িয়ে ভূতকে দেখাতে চেষ্টা করলাম। আহা! কী হয়েছে 'বলবি তো?' আমি বললাম? 'ওই যে ভূত।' কাকু আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল 'কোথায় ভূত'? আমি আস্তে আস্তে পেছনে ফিরে হাত দিয়ে দেখলাম ওই যে লম্বা ভূত, আমাকে সামনে যেতে ইশারায় মানা করছে। আমার কথা শুনে কাকু হাসতে হাসতে বলল, আরে বেকুব, এটাতো কলা গাছ। কাকুর হাত ধরে সাহস করে কাছে গিয়ে দেখি সত্যি তো কলা গাছ। জ্যোৎস্নার আলোতে কলা গাছটিকে লম্বা মানুষের মতো আর কলা গাছের পাতাগুলো ছেঁড়া ছেঁড়া থাকায় সেগুলোকে লম্বা লম্বা আঙুল মনে হচ্ছিল। হালকা বাতাসে পাতা দুলছিল। আর সেটাকেই মনে হচ্ছিল 'ইশারায় সামনে যেতে বারণ করছে'।

কাকুর হাত ধরে ধরে বাড়ি গিয়েও ভূতের ভয় কাটছিল না। বিছানায় দাদিমাকে জড়িয়ে শুয়েছিলাম। এপাশ ওপাশ করেও ঘুম আসছিল না। শুধু মনের ভূতের কথাই মনে পড়ছিল বার বার। আজও আমার হৃদয়ে এ মনের ভূত আবিষ্ট করে রেখেছে। ❑

সেকশন অফিসার (অবসরপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা



লিলিপুটের ছানা

মো. মোশফিকুর রহমান

চারিদিকে থমথমে একটা ভাব, স্কিটো গ্রহ হতে একটা ছোট্ট লিলিপুটের ছানা পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়েছে। কেউ জানে না এটা কতটা ক্ষতির কারণ হতে পারে আমাদের পৃথিবীর প্রাণীকুলের জন্য। দেশি-বিদেশি টিভি ও অনলাইন সংবাদ মাধ্যম হতে সবাইকে সাবধান করা হচ্ছে, কেউ যেন দলবদ্ধ

না হয়ে বাড়ির বাহিরে না যায়। এ সময় যতটা সম্ভব ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে রাখতে হবে। কেননা সামান্য একটু ছিদ্র দিয়েই লিলিপুটটা প্রবেশ করে সবকিছু শেষ করে আবারও চোখের পলকেই হারিয়ে যেতে পারে।

এদিকে বিবিসি নিউজ চ্যানেল তো আরও ভয়ানক তথ্য দিয়েছে, তারা স্যাটেলাইট তথ্য বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন, লিলিপুটটি খুব সম্ভবত বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ছোট্ট একটা গ্রাম বনানীপাড়ার ভিতরের বড়ো একটা বাঁশবাগানে অবস্থান করছে। কেননা গত কয়েকদিন ধরে এখানকার বাঁশবাগানের উদ্ভিদগুলো অন্যরকম আচরণ করছে। এই বাঁশঝাড়ের মাঝখানের উদ্ভিদগুলোর রং পরিবর্তন হয়ে অন্য আকার ধারণ করেছে।

এই বাঁশঝাড়টাতে সচরাচর কেউ পা ফেলে না, কেননা এখানে চীনা জোঁকের এত বেশি উৎপাত যে কেউ একবার এলে দ্বিতীয়বার আর এ মুখো হয় না! কেউ কল্পনাও করতে পারছে না, লিলিপুটটা আসলে কতটা ভয়ংকর প্রাণী! এদিকে বনানীপাড়ার লোকজনের জন্য আরও ভয়ানক খবর হলো সকাল হতে এলাকার সবচেয়ে চঞ্চল ও দুষ্টু প্রকৃতির ছেলে বিল্লাহ আর শামিমকে খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না। সকালবেলা দুই চাচাতো ভাই একসাথে টিভিতে ঘণ্টাখানেক সংবাদ দেখেছে, যদিও-বা এরা কার্টুন ছাড়া অন্যকিছু দেখে না। তাদের জ্বালায় বাসার কেউ টিভি দেখে শান্তি পায় না। তারা কার্টুন দেখতে না পারলে মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি শুরু করে দেয়। বাধ্য হয়েই একসময় বাড়ির লোকজন তাদের হাতে রিমোটটা দেয়। কিন্তু আজ এদের দুজনের মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। কিছুক্ষণ পর পরেই দুজনেই হাওয়া! সেই সাথে তাদের দুজনের গচ্ছিত বড়ো বড়ো ইলেকট্রনিক বস্তাও উধাও!

আচ্ছা এদের দুজনকে আবার জানালার ফাঁক দিয়ে লিলিপুটটা ধরে নিয়ে যায়নি তো! কিন্তু বস্তা দুটো কীভাবে গায়েব হলো? আচ্ছা লিলিপুটটা কী তাদের ধরে নিয়ে এতক্ষণে খেয়ে ফেলেছে! চারদিকে লোকজন দলবেধে তাদের খোঁজ করছে কিন্তু কোথাও তাদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এলাকার বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ সবাই ভয়ে অস্থির, কী হবে এখন আল্লাহই জানেন। সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো তবুও দুজনের কোনো খোঁজ মিলল না। রাত যত গভীর হচ্ছে এলাকার পরিবেশ আরও থমথমে হচ্ছে। সবার বাড়িতেই আগুনের মশাল জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে যাতে লিলিপুটটা ভয়ে এদিকে আসতে না পারে।

রাত বারোটা নাগাদ আরও রহস্যময় ঘটনা ঘটল, কারও ফোনে নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছে না। রাতটাও বিদঘুটে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, এর মধ্যে হঠাৎ বাঁশ কাটার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে লিলিপুটটা খিদের জ্বালায় বাঁশ চিবিয়ে খাচ্ছে। তাহলে কি লিলিপুটদের স্কিটো গ্রহের সবাই বাঁশ খায়! আমরা যেভাবে আখের রস মজা করে খাই, ওরাও মনে হয় সেভাবেই বাঁশের রস খায়। যাক সে কথা, রাত তিনটা নাগাদ সবাই লক্ষ্য করল, বাঁশ বাগানের অনেক উপরে একটা লাল সিগনাল বাতি জ্বলে উঠল। আলোটা দেখে মনে হলো, মোবাইল টাওয়ারে যেভাবে একটা লাল বাতি জ্বলে থাকে তেমন কিছু। আর বেশি কিছু বোঝার উপায় নেই। তবে সেখানে দুজন যে ওঠানামা করছে এটা বোঝা যাচ্ছে, তারমানে এখানে একটা নয় দুটো লিলিপুট আছে। সবার মাঝে ভয়ের মাত্রা আরও বাড়ছে কেননা তারা গত কদিন শুনেছে একটা লিলিপুটের কথা কিন্তু এখন না জানি কতগুলো লিলিপুট এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

হঠাৎ ভোর রাতে আকাশে ভোঁ ভোঁ আওয়াজে সবকিছু ওলটপালট হচ্ছে, গাছের পাখিরাও রাতের অন্ধকারেই ওড়াউড়ি শুরু করল, দূর আকাশে একটা স্পেসশীপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যেটা আবার এই বনানীপাড়ার দিকেই ধেয়ে আসছে। এবার নিশ্চিত এই এলাকার কারও রক্ষা নেই। লিলিপুটরা এবার সবাইকে আক্রমণ করবে। সবাই যার যার মতো লাঠিসোটা নিয়ে প্রস্তুত থাকল। এবার নিশ্চিত সবাইকে লিলিপুটদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে নয়তো তাদের হাতে বন্দি হতে হবে।

এক সময় রাত পেরিয়ে সকাল হলো। ধীরে ধীরে স্পেসশীপটা বাঁশঝাড়ের মাঝে এসে পরল, আর অপরিচিত একটা আওয়াজে চারপাশ ভরে গেল।



কী হচ্ছে ওখানে সবাই জানতে উৎসুকভাবে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ বাঁশ দিয়ে তৈরি বিশাল টাওয়ারটার মাথায় একটা বড়ো লিলিপুট উঠে গেল, তার সাথে সাথে বিল্লাহ আর শামিম। তাহলে কি লিলিপুটগুলো এদের এই টাওয়ার হতে ফেলে দেবে! এমন সময় লিলিপুটটা হাতের মাইকে ঘোষণা দিল, আমরা আপনাদের কোনো ক্ষতি করব না, আমরা আমাদের গ্রহে ফিরে যাব। হঠাৎ-ই আমাদের টেকনিক্যাল ভুলের কারণে আমাদের একটা ছোট্ট লিলিপুট এখানে পড়ে যায়, সে গত কয়েকদিন ধরে শুধু কান্না করছে। আমরা অনেক দূর হতে তার কষ্ট দেখেছি কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। কিন্তু এখানকার

দুই খুদে বিজ্ঞানী বিল্লাহ আর শামিম মিলে বাঁশ দিয়ে এই টাওয়ার তৈরি করে এখানে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিকস ডিভাইস স্থাপন করে হারিয়ে যাওয়া লিলিপুটের সাথে আমাদের সংযোগ স্থাপন করে দিয়েছে। এজন্য আপনারা অনেকটা সময় মোবাইল নেটওয়ার্কের বাহিরে ছিলেন। তাই আপনাদের মনুষ্য জাতির কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব, আজ থেকে আপনারা আমাদের বন্ধু। আপনাদের দেশের সকল শিশুর জন্য স্কিটো গ্রহের দরজা সব সময়ই খোলা থাকবে। লিলিপুট গ্রহের নেতা তার হাতের জাদুর কাঠিটা বিল্লাহ আর শামিমকে উপহার স্বরূপ দিয়ে দিলেন। এটি দিয়ে প্রতিদিন তারা তাদের একটি করে মনের ইচ্ছে পূরণ করতে পারবে।

এরপর তিনজনই টাওয়ার হতে নেমে এল। এবার লিলিপুটদের চলে যাওয়ার পালা। এক এক করে সবাই বিল্লাহ আর শামিমকে কোলে তুলে নিল আর আদর করল। ছোট্ট সেই লিলিপুটটির চোখ জোড়া অশ্রুসিক্ত, সে বিশ্বাস করতে পারছে না এভাবে সে আবারও তার স্বজাতির কাছে ফিরে যেতে পারবে। একসময় তার মনে হয়েছিল মানুষরা অনেক হিংস্র হয়। কিন্তু বিল্লাহ আর শামিমকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে তার সে ধারণা পালটে যায়। তারা লিলিপুটের কষ্টের কথা টিভিতে দেখে কাউকে কিছু না জানিয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে এবং সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সফল হয় আর দুই গ্রহকে এক করে দেয়। ছোট্ট সে লিলিপুট তার প্রিয় দুই বন্ধু বিল্লাহ আর শামিমকে তাদের গ্রহে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে কান্নাভেজা চোখে বিদায় নেয়। এরপর তাদের স্পেসশীপ ধীরে ধীরে স্কিটো গ্রহের দিকে চলতে থাকে। যেতে যেতে একসময় স্পেসশীপটি আর খালি চোখে দেখা যায় না। বিল্লাহ আর শামিম জাদুর কাঠিটি নিয়ে মনের আনন্দে বাড়িতে ফিরে আসে, আর প্রতিদিন তাদের একটি করে মনের ইচ্ছে পূরণ করে। এরপর চারপাশে তাদের নামডাক ছড়িয়ে পরে... ❑

লেখক ও এনজিও কর্মী



ভূত দেখতে

ফেরদৌস জামান খোকন

যাব সবাই একই সাথে
মোটু ভূতের বাড়ি,
ভূত নাকি পরে থাকে
লম্বা কালো শাড়ি।

শুনে পুটু এবার বলে
চলো ঘুরে আসি,
ধরতে পারলে ভূতকে মোরা
দিব কান মলি।

রাতের বেলা আসিস সবে
যাব ভূতের পিছু,
অনেক দূরে যেতে হবে
ভয় নাই রে কিছু।

রাতের বেলা সবাই মিলে
ছুটে চলে জোরে,
ভূতকে দেখে ফিরতে সবে
বাড়িতে যে ভোরে।

মোটু ভূতটা অনেক চালাক
গাছের ডালে থাকে,
হঠাৎ করে শব্দ শুনে
নাঁকি সুরে ডাকে।

ভাঙা বাড়ি

মো. আবুল হোসেন

ঘড়ির কাঁটা থেমে যায়
রাত ঠিক বারোটায়,
সময়ও ভয় পায়
বুঝি ওই বাড়িটায়।

রাত বারোটার পরে
পাথরের বৃষ্টি ঝড়ে,
ভাঙা বাড়ির ভেতরে
সবাই দিশেহারা ভয়ে।

ভয় আর বিস্ময়ে
জমে থাকে শিহরণ,
ভূতুরে বাড়ি যেন
অজানা এক স্মরণ।

ফিকলু

সাবরিন সুলতানা



রাত তখন বারোটা। বাইরে ঘন কুয়াশা। দীপ্ত লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। হঠাৎ মনে হলো, খাটের নিচ থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ আসছে।

হি... হি... হি...

শব্দটা ইঁদুর বা তেলাপোকার নয়। একদম মানুষের হাসির মতো, কিন্তু খুব চাপা। দীপ্ত প্রথমে ভাবল মনের ভুল। কিন্তু আবার শোনা গেল- হি... হি... হা... হা... হা...।

এবার দীপ্ত একটু নড়েচড়ে বসল। সাহস সঞ্চয় করে মোবাইলটা হাতে নিলো সে। ভয়ের চেয়ে কৌতূহলই তার বেশি। ঝট করে মাথা নিচু করে খাটের তলায় তাকাতেই মোবাইলের টর্চটা জ্বালিয়ে দিল।

খাটের নিচে একটা ছোটোখাটো, গোলগাল চেহারার অদ্ভুত জিনিস গুটিসুটি মেরে বসে আছে। গায়ের রং নীলচে, যেন ধোঁয়া দিয়ে তৈরি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল আর চোখ দুটো বড়ো বড়ো ও গোল গোল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, আলো পড়ার সাথে সাথে জিনিসটা ভয় পাওয়ার বদলে দীপ্তর দিকে তাকিয়ে হিহি করে একগাল হেসে দিলো। তার দাঁতগুলো মুক্তোর মতো চকচকে।

দীপ্ত অবাক হয়ে বলল, 'এই, তুমি কে? খাটের নিচে কী করছ?'

নীল রংয়ের অদ্ভুত প্রাণীটা লজ্জা পেয়ে জিভ কাটল। তারপর মিহি গলায় বলল, 'ধুর ছাই। আমি জানতাম ধরা পড়ে যাবো। আমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।'

দীপ্ত একটু ধমক দিয়ে বলল, 'তুমি কি চোর?'

'ছি ছি। চোর হতে যাবো কেন? আমি ভূত। আমার নাম ফিকলু।'

'ভূত!' দীপ্ত চমকে উঠল বটে, কিন্তু ভয় পেল না। কারণ ফিকলুকে দেখলে ভয় পাওয়ার বদলে গাল দুটো চটকে দিতে ইচ্ছে করে।

ফিকলু খাটের নিচ থেকে বেরিয়ে মেঝের ওপর বসল। তার শরীরটা মাটির ওপর একটু ভেসে আছে। সে করুণ মুখে বলল, 'হ্যাঁ, আমি ভূত। কিন্তু সমস্যা হলো, আমি মোটেও ভয়ানক নই।'

দীপ্ত হেসে ফেলল, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তুমি আমার খাটের নিচে কেন?'

ফিকলু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সে এক বিরাট দুঃখের কথা। আমাদের ভূত সমাজের নিয়ম আছে। একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর আমাদের মানুষকে ভয় দেখানোর পরীক্ষায় পাস করতে হয়। তাই ভূত ইশকুল থেকে আমাকে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে।'

'আমার কাছে কেন?'

'কারণ স্যার বলেছেন, তুমি নাকি খুব সাহসী ছেলে। তোমাকে ভয় দেখাতে পারলে আমি এ প্লাস পাবো। কিন্তু...'

ফিকলু মাথা চুলকালো, 'সমস্যা হলো, আমার খালি হাসি পায়। মানুষ দেখলেই কেমন যেন সুড়সুড়ি লাগে। আর ভূত হাসলে তো মানুষ ভয় পায় না, উলটো মজা পায়।'

দীপ্ত এবার হো হো করে হেসে উঠল। 'তার মানে তুমি ভয় দেখানোর প্র্যাকটিস করতে এসেছিলে?'

ফিকলু- মাথা নাড়ল। 'ভেবেছিলাম অন্ধকারে একটা ভয়ানক শব্দ করব। কিন্তু মাথার ওপর একটা মানুষ শুয়ে আছে- মনে পড়তেই আমার এমন হাসি পেলো...ব্যাস, তুমিও লাইট জ্বেলে দিলে। এখন আমার কী হবে? স্যার তো আমাকে আর ভূত সমাজে ঢুকতেই দেবেন না।'

ফিকলুর ছলছলে চোখ দেখে দীপ্তর খুব মায়া হলো। সে বলল, 'শোনো ফিকলু, ভয় দেখানোই কি ভূতের একমাত্র কাজ? তোমরা কি বন্ধু হতে পারো না?'

ফিকলু চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'বন্ধু? মানুষের সাথে? কিন্তু নিয়ম যে...'

'দেখো, তুমি যদি আমাকে ভয় দেখাতে চাও, তবে তোমাকে ভয়ানক হতে হবে। বড়ো বড়ো নখ বের করতে হবে, পচা পচা গলায় কথা বলতে হবে। পারবে?'

ফিকলু চেষ্টা করল। মুখটা বিকৃত করে, হাত দুটো উঁচু করে বলল- ভাউউউ...

কিন্তু শব্দটা শোনালো বিড়ালের মতো। দীপ্ত হাসি চাপতে পারল না। ফিকলুও নিজের কাণ্ড দেখে লজ্জা পেলো।

দীপ্ত তাকে অভয় দিয়ে বলল, 'থাক, ওসব তোমাকে দিয়ে হবে না। তারচেয়ে বরং তুমি হাসিখুশি ভূত হিসেবেই থাকো। জানো, মানুষকে ভয় দেখানোর চেয়ে হাসানো অনেক বেশি কঠিন কাজ।'

'সত্যি? হাসানো ভালো কাজ?' ফিকলুর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'অবশ্যই। পৃথিবীর সবাই এখন খুব গম্ভীর। কেউ হাসতে চায় না। তুমি যদি মানুষকে হাসাতে পারো, তবে তুমি হবে স্পেশাল ভূত।'

ফিকলু আহ্লাদে গদগদ হয়ে বলল, 'তাহলে আমি আর ভয় দেখানোর প্র্যাকটিস করব না। কিন্তু স্যারকে কী বলব?'

দীপ্ত বুদ্ধি দিলো, 'বলবে- আমি এত বেশি হেসেছি যে হাসি দেখে ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে গেছে। ব্যস, তোমার কাজও হলো, আবার আমারও ক্ষতি হলো না।'

ফিকলু আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল, 'দারুণ বুদ্ধি, দীপ্ত।'

'তুমি আমার নাম জানো?'

'হ্যাঁ। আমাদের কাছে পৃথিবীর সব সাহসী মানুষের লিস্ট আছে। সেখানে নাম-ঠিকানা দেখেই তো তোমাদের বাড়িতে এসেছি।'

সেই রাতটা ফিকলু দীপ্তর খাটের নিচেই নিরাপদ আশ্রয়ে থাকল। সকালে দীপ্ত হাসিমুখে তাকে বিদায় দিলো। ফিকলু হাত নাড়তে নাড়তে ধীরে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

দীপ্তর মনে হলো, আমাদের চারপাশের সবাইকে একটু হাসানোর জন্য একটা করে 'ফিকলু' থাকা খুবই জরুরি। ❑

গল্পকার

ভৌতিক রাত

মোস্তাফিজুল হক



নির্জন পুরনো বাড়ি। মাঘের রাত। কনকনে শীতের আমেজ। চারদিকে নেমে এসেছে এক গভীর নীরবতা। অপুর বাবা অফিসের জরুরি কাজে ঢাকায় গিয়েছেন। মা ফসল বুঝে নিতে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছেন। এদিকে শহরের বাড়িটাকেও ঠিক সেভাবে শহর বলা যায় না, শুধুই কাগজে-কলমে শহর। অপুর বাবার দাদু চাকরির সুবাদে তিন একর জমিতে শহরতলির এই বাড়িটা তৈরি করেন। ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়া সেই বাড়িরই একখণ্ডে অপুদের ঘর। আম-জাম, কাঁঠাল, উঁচু উঁচু নারকেল আর কদম গাছে ঘেরা টিনশেড আধাপাকা বাড়ি। বাড়িটার পুবদিকে একটা পরিত্যক্ত বাড়ি, উত্তর ও পশ্চিম দিকে অনেকটা ফাঁকা। খানিকটা দূরে কয়েকটা পুরনো বাড়ি। পৌনে দুইশত বছরের পুরনো ছোট্ট শহরটি এখন ক্রমাগত আধুনিক নগরের রূপ নিচ্ছে। অপুর বাবাও পেনশনে এসে বহুতল বাড়ি করবেন। এরকমই এক বাড়িতে দাদু হক সাহেব এবং অপু পৃথক কক্ষে গভীর ঘুমে মগ্ন।

চারদিকের নীরবতা ভেঙে দিয়ে হঠাৎ কীসের যেন একট আওয়াজ হলো। অদ্ভুত এক খটাস শব্দে অপুর ঘুম ভেঙে গেল।

ঘরের ভেতরের ফাঁকা কক্ষে তখনও এক রহস্যময় শব্দ হচ্ছিল।

'খটর খট্, কটর কট্ খট্, খটস...'

এরকম একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে অপুর বুক ধড়ফড় করে কাঁপছে। এবার শব্দটা ঠিক যেন জানালার দিক থেকে আসছে। তবে জানালার ওপাশের কদম গাছটায় ভূত থাকে নাকি? ওরাই কি জানালার পাশে এসে ওরকম শব্দ করছে? অজানা এক ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে লেপ দিয়ে মুখ ঢেকে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল অপু। থেকে থেকে ওর শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে, হয়ত কোনো এক দুষ্টু সত্তা গভীর রাতে জানালার পাল্লা নাড়ছে।

'তুই কে রে বাপু? গভীর রাতে জানালায় খট্ খট্ করিস!'– অপু এটা বলতে চেয়েও বলতে পারে না। ওর দাদুকে যে ডাকবে, সে সাহসও ওর হয় না।

ফাঁকা বাড়িতে ভীষণ ভয় নিয়ে রাত কাটল অপুর। অন্যদিন ওর পোষা বিড়াল মুনিয়া ওর সাথেই ঘুমোয়, আজ ওটাও নেই। কে জানে কোথায় লেজ গুটিয়ে শুয়ে আছে?

পরদিন জানালা দিয়ে ভোরের আলো ঘরে ঢুকতেই অপুর সাহস ফিরে এল। রাতে কে এভাবে শব্দ করল, কে তাকে ভয় দেখাতে চাইল– এ রহস্য যে উদঘাটন করতেই হবে।

অপু ভীরু ভীরু চোখে কাঁপা কাঁপা পায়ে খুব সাবধানে মাঝের কক্ষে গেল। সে ভীষণ অবাক হয়ে খেয়াল করল, কক্ষের একটা জানালায় সামান্য ফাঁকা। আর সেই ফাঁক দিয়ে আলতো বাতাস এসে নড়বড়ে পাল্লায় দোল দিয়ে যায়। বাইরে তখন ভোরের শান্ত প্রকৃতি।

জানালার পাল্লার নিচে সামান্য রক্তের দাগ। অপু এবার সত্যি সত্যিই ভড়কে গেল: 'এখানে রক্ত কেন? তাহলে আসল ঘটনাটা কী? গতকাল রাতে কী এমন কাণ্ড ঘটে গেল!'

অপু কিছুটা থমকে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে আছে। ঠিক তখনই একটা দারুণ ব্যাপার ঘটে গেল। না, এ কোনোও ভূতুড়ে ঘটনা নয়, কিংবা কোনো অতি রহস্যও নয়– বরং কিছুটা হাস্যকর ঘটনাই বটে!

দারুণ এক গর্বিত ভঙ্গি নিয়ে অপুর পোষা বিড়াল মুনিয়া ওর সামনে দাঁড়িয়ে– যেন সে দিগ্বিজয়ী কোনো এক রাজপুত্তুর। ওর চোখেমুখে বিজয়ীর দ্যুতিময়তা। মুনিয়া সগৌরবে ওর শিকার করা ইঁদুরটি মুখে নিয়ে অপুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে!

সেই রাতে ইঁদুরটাকে তাড়া করবার সময় মুনিয়ার থাবার আঘাতে জানালায় ওরকম শব্দ হয়েছিল। ইঁদুরটা জানালার সামান্য ফাঁক দিয়ে পালাতেও চেয়েছিল। সমস্ত ঘটনা বুঝতে পেরে এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অপু। সে মনে মনে নিজেকে ভীতুর ডিম ভেবে বেশ লজ্জাই পেল। ❑

ছড়াকার, কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষক



ভূতের ভয়

মজনু মিয়া

ভূত কথাটি খুব ভূতুড়ে
খোকা খুকি ভয় পায়,
বাবা ও মা সাথে থাকলে
ভয়টাতেও যে জয় পায়।

বাবা মায়ের সাথেই একদিন
রাতের বেলা বের হয়,
হঠাৎ সামনে অদ্ভুত কিছু
ভূত বলে মা টের পায়।

খোকা খুকি ভীষণ ভয়ে
কেঁপে কেঁপে চুপ রয়,
বাবা মায়ে সাহস করেই
সামনে গিয়ে টুপ লয়।

ভূত হলে তো অনেক কিছু
জানা যাবে সেই সব,
সেই আলামত নেই কিছু তার
বিশৃঙ্খলার নেই রব।

ভূতের বাসা

শামসুল আরেফীন

ভূতের ভয়ে সন্ধ্যা হলে
থাকত সবাই ঘরে,
গভীর রাতে ভূতের গল্পে
শরীর কেমন করে।

মধ্যরাতে ভূতে নাকি
নামে গাছের তলে,
সুযোগ বুঝে হুরুম ভূতে
ধরবে শক্তিবলে।

তেঁতুল গাছে ভূতের বাসা
রাতে শব্দ করে,
চেয়ে থাকে পথের দিকে
হঠাৎ মানুষ ধরে।

ভূতের ভয়ে তেঁতুলতলায়
আসে না আর লোকে,
শৈশবকালে ভূতের গল্প
শুনতাম মায়ের মুখে।

তেঁতুল গাছে ভূতের বাড়ি

মো. মোজাম্মেল হক

জানো কি ভূতের বাড়ি কোথায়,
পুরনো সেই তেঁতুল গাছের ছায়ায়।
দরজাটা তার কিঞ্চিৎ বাঁকা,
অন্ধকারে ঝলমলে যায় দেখা।

লতাপাতা ঝুলে জানালায়,
একটুও নড়ে না ঝড়ো হাওয়ায়এ
গান গায় ভূত চাঁদনি রাতে,
পেতনিরা সব থাকে সাথে।

তোমরা কি জানো ভূতেদের ঠিকানা,
পুরনো বাড়ি নাকি ভূতদের আস্তানা
ভূত বলে কিছু আছে কি না,
এখনো তা সবার কাছে অজানা।

অক্ষর চেনা ভূত

মির্জা রিজওয়ান আলম

তালপুকুর গ্রামের শেষ মাথায় যে বিশাল পুরনো বটগাছটা আছে, ইদানিং ওদিকের রাস্তা দিয়ে কেউ আর যাতায়াত করে না। বিশেষ করে স্কুলের ছেলে-মেয়েরা তো ওই পথ একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে। কারণ একটাই- বুনো ভূত।

ভূতটার নাম গলুমলু। গলুমলু দেখতে যেমন ভয়ংকর, তার স্বভাবও তেমন অদ্ভুত। সে নিজে তো পড়াশোনা করেইনি, গ্রামের অন্য ছেলে-মেয়েরা স্কুলে গেলেও তার খুব রাগ হয়।

সকালবেলা কোনো বাচ্চা বই-খাতা নিয়ে ওই পথ দিয়ে গেলেই গলুমলু মগডাল থেকে লাফিয়ে নিচে নামে। তারপর বিকট চিৎকার করে বলে, 'খবরদার স্কুলে যাবি না। ওই সাদা সাদা কাগজগুলো (বই) ফেলে দে, নইলে ঘাড় মটকে দেবো।'

ভয়ে বাচ্চারা দৌড়ে পালায়। ফলে গ্রামের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাওয়া প্রায় বন্ধ হতে বসেছে।

সেদিন রিমি স্কুলে যাওয়ার জন্য বের হয়েছে। এখন তারা যে পথ দিয়ে স্কুলে যায়, সেটার মাঝখানে নাকি বিশাল একটা গর্ত করে কী যেন কাজ করা হচ্ছে। তাহ, ওই পুরনো রাস্তা ছাড়া স্কুলে যাওয়ার আর কোনো পথ নেই।

এই অবস্থা দেখে অনেকেই স্কুলে না গিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। কিন্তু রিমি ঠিক করল, আজ ওই পথ দিয়েই যাবে। রিমিকে দেখে আরো কয়েকটা ছেলে-মেয়ে পেছন পেছন যেতে লাগল। কিন্তু বটতলায় আসতেই ঝপ করে সামনে এসে দাঁড়ালো গলুমলু ভূত। তার লাল লাল চোখ আর জট পাকানো চুল দেখে রিমির বুকটা ধড়ফড় করে উঠল।

গলুমলু হুংকার দিয়ে বলল, 'আবার ইশকুল? দে, তোর বই ফেলে দে।'

রিমি ভয়ে পিছাতে গিয়ে একটা ইটের সঙ্গে হোঁচট খেলো। ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে। হাত থেকে



ছিটকে পড়ল রং-বেরঙের মলাট আঁকা বাংলা বইটা।

বাতাসের ঝাপটায় ওই বইয়ের পাতাগুলো উলটে গেল। বইয়ের মাঝখানে ছিল খুব সুন্দর একটা রঙিন ছবি- একটা বাঘ আর একটা হরিণ বনে খেলা করছে।

গলুমলু ভূত বইটা ছুড়ে মেরে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ তার চোখ আটকে গেল ওই ছবিটায়। সে অবাক হয়ে থমকে গেল। জীবনেও সে এমন রঙের খেলা দেখেনি। সে কুঁজো হয়ে বইটা মাটি থেকে তুলে নিলো। তারপর উলটে-পালটে ছবিটা দেখতে লাগল।

রিমি ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ালো। ভূতটা বইয়ের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। গলুমলু বিড়বিড় করে বলল, 'এরা কারা? এই কাগজের ভেতর এরা কী করছে? আর এই নিচে কালো কালো ওগুলো কী? পিঁপড়ে?'

রিমি সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'ওগুলো পিঁপড়ে না, ওগুলো অক্ষর। আর ওটা একটা গল্প।'

গলুমলু বোকার মতো তাকালো। 'গল্প? এই কাগজের ভেতর গল্প থাকে? কিন্তু আমি তো কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমি যে পড়তে পারি না রে, খুকি।'

গলুমলুর গলাটা হঠাৎ খুব করুণ শোনালো। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল- 'আমি যখন স্কুলে যেতাম সবাই তখন আমাকে বোকা বলত। এখন ভূত হয়েও আমি বোকাই থেকে গেলাম।'

রিমির খুব মায়া হলো। সে একটু এগিয়ে গিয়ে খুব নরম গলায় বলল, 'এখন আমাদের স্কুলে একটুও মারে না, বকাও দেয় না। স্যার-ম্যামরা আমাদের খুব আদর করে। স্কুলটা অনেক মজার জায়গা। তুমি যদি আমাকে ভয় না দেখাও, তাহলে এই বইয়ের গল্প আমি তোমাকে পড়ে শোনাতে পারি।'

গলুমলুর চোখ চকচক করে উঠল, তার ভাষাও 'তুই' থেকে 'তুমি' হয়ে গেল। 'সত্যি শোনাবে? এখন আর মারধর করে না? ঠিক আছে, আমি তবে ভয় দেখাবো না।'

রিমি ধুলো ঝেড়ে বইটা গলুমলুর হাত থেকে নিলো। তারপর মিষ্টি গলায় পড়তে শুরু করল-

হাট্টিমা টিম টিম,
তারা মাঠে পাড়ে ডিম,
তাদের খাঁড়া দুটো শিং ...

গলুমলু মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগল। রিমি ছড়াটা শেষ করে একটা বাঘের গল্প শোনালো। গল্প শুনে গলুমলু কখনো হাসল, কখনো বাঘের দুঃখে তার চোখ ছলছল করে উঠল।

পড়া শেষ হলে গলুমলু বলল, 'বই তো খুব মজার জিনিস। এর ভেতরে তো পুরো দুনিয়া লুকিয়ে আছে। আমি কেন যে মিছেমিছি তোমাদের স্কুলে যেতে মানা করতাম।'

রিমি হাসল, 'তুমি শুনতে চাইলে আমি তোমাকে রোজ পড়ে শোনাবো। এমনকি তোমাকে অ-আ-ক-খ শেখাতেও পারি।'

গলুমলু আনন্দে লাফ দিয়ে মগডালে উঠে গেল, আবার নেমে এল।

'শেখাবে? তাহলে আজ থেকে আর কোনো বাচ্চা স্কুলে গেলে আমি ভয় দেখাবো না। ওদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবো।'

সেই থেকে তালপুকুর গ্রামের বটতলায় আর কোনো ভয়ের পরিবেশ নেই। এখন বাচ্চারা নির্ভয়ে স্কুলে যায়।

তবে গ্রামের মানুষ একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পায়। মাঝে মাঝে গভীর রাতে চারদিক যখন নিঝুম হয়ে যায়, তখন ওই পুরনো বটগাছটায় জোনাকি পোকারা ভিড় করে। সেই জোনাকির আলোয় গলুমলু ভূত গাছের ডালে পা দুলিয়ে বসে থাকে। তার হাতে একটা বর্ণপরিচয় বই। সে বিড়বিড় করে বানান করে পড়ার চেষ্টা রে- অ-তে অজগর, আ-তে আম...

শিক্ষার্থী, দ্বাদশ শ্রেণি, টেকেরহাট, পোস্ট: খালিয়া, উপজেলা: রাজৈর, জেলা: মাদারীপুর

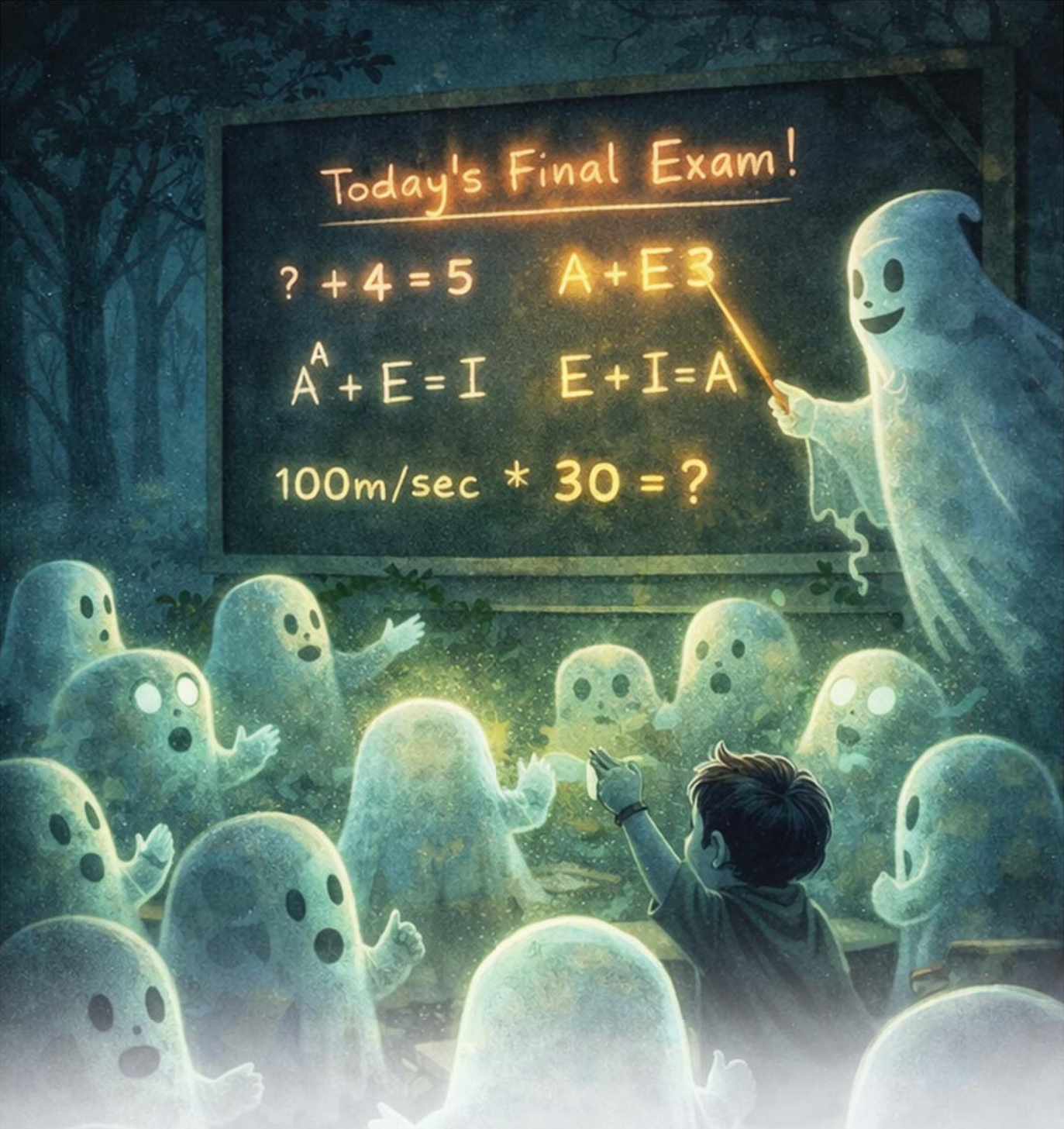

ভূতুর গণিত শেখা

পল্লব শাহরিয়ার

ঙ এর ছেলে ভূতু। ভূতু ভূতের আজ প্রথম ক্লাস। অনেক দূরের এক গোপন জঙ্গলে আছে 'ভূতপুর'। সেখানে শুধু ভূতেরা থাকে! আর ওদের জন্য আছে এক অদ্ভুত স্কুল- ভূতপুর অঙ্ক স্কুল! এই স্কুলে ভূতেরা অঙ্ক শেখে, কিন্তু কেন? ভূতদের তো আর চাকরি করতে হবে না! বাজারও করতে হয় না! তাহলে ওরা অঙ্ক শেখে কেন?

ব্যাপারটা বেশ মজার। ভূতেরা অঙ্ক না শিখলে কী হয় জানো? ওরা একে অপরকে গুনতে পারে না! ফলে এক ভূতের সঙ্গে আরেক ভূত মিশে গেলে কেউ বুঝতে পারে না কতজন ভূত! ভূতু প্রথমবারের মতো ক্লাসে বসেছে। সামনে বড়ো একটা কালো বোর্ড, কিন্তু সেখানে চক দিয়ে কিছু লেখা নেই। কেন জানো? কারণ ভূতেরা চকের বদলে আলোর রেখা দিয়ে অঙ্ক করে! ভূতু ভূত একটু ভয় পাচ্ছিল। সে কখনোই অঙ্ক করেনি! স্যার আসতেই ভূতু তাকে জিজ্ঞেস করল- স্যার, অঙ্ক শিখতে হবে কেন?

স্যার হেসে বললেন- বুঝতে পারবে, একটু অপেক্ষা করো!

স্যার বোর্ডে আলো দিয়ে লিখলেন- আজকের ক্লাস: সংখ্যা কী?

সব ভূত চুপচাপ বসে আছে। কিন্তু ভূতু ভূত মনে মনে খুবই চিন্তিত! সংখ্যা মানে তো এক, দুই, তিন, চার! কিন্তু ভূতেরা কি গুনতে পারে?

ঠিক তখনই একটা মজার ঘটনা ঘটল! একটি ভূত ঢুকল ক্লাসে, দুইটি ভূত বেরিয়ে গেল!

সবাই অবাক! এখন ক্লাসে কয়জন ভূত রইল? ভূতু তো পুরো গুলিয়ে গেল! সে গুনে দেখল- আচ্ছা, প্রথমে ১০ জন ছিল, তারপর ১ জন এল, মানে হলো ১১! কিন্তু আবার ২ জন চলে গেল, তাহলে হলো ৯! আহা, সংখ্যা তো ম্যাজিকের মতো কাজ করছে!

স্যার হেসে বললেন- এই যে যোগ আর বিয়োগ! এখন বুঝলে?

ভূতু ভূত অবাক হয়ে বলল- ওহো! সংখ্যার খেলা কত মজার!

ভূতুর মনে আরও অনেক প্রশ্ন জমে গেল। ভূতেরা যদি আলো হয়, তাহলে তাদের কি সংখ্যা আছে? যদি ২টা ভূত এক হয়ে যায়, তাহলে তারা ১ জন হয়ে যায় নাকি ২ জনই থাকে? ভূতদের ওজন নেই, তাহলে ১০০টা ভূত কি ১টা ভূতের সমান?

স্যার হেসে বললেন- এসব রহস্য একে একে জানবে! তবে আগে যোগ, বিয়োগ, গুণ আর ভাগ শিখতে হবে!

ভূতু ভূত ভাবতে লাগল- হুম, তাহলে তো আমাকে ভালো করে অঙ্ক শিখতেই হবে!

ভূতু ভূত একটু চিন্তিত। সে যোগ-বিয়োগের ব্যাপারটা কিছুটা বুঝতে পারছিল কিন্তু স্যার এক নতুন সমস্যা দিলেন- তিন ভূত ক্লাসে এল, দুই ভূত চলে গেল! এখন কয়জন ভূত রইল?

ভূতু ভূত মাথা চুলকাতে লাগল। পাশে বসা ভূতান ভূত বলল- এ তো খুব সহজ! ৩ - ২ = ১, তাই উত্তর ১!

ভূতু বলল- কিন্তু ভূতেরা তো মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়! তাহলে কীভাবে জানব, ওরা সত্যি চলে গেছে নাকি শুধু লুকিয়ে আছে?

সব ভূত চুপ হয়ে গেল! এই সমস্যার সমাধান করতে হবে!

স্যার বললেন, ঠিক আছে, আমরা পরীক্ষা করে দেখি! তিনজন ভূত দাঁড়ালো বোর্ডের সামনে। তারপর দুজন একসঙ্গে চোখ বন্ধ করল।

স্যার জিজ্ঞেস করলেন- এখন কয়জন ভূত দেখা যাচ্ছে?

ভূতু বলল- একজন!

স্যার আবার বললেন- ৫ ভূত ছিল, ৩ ভূত লুকালো। কয়জন রইল?

ভূতু বলল- ৫ - ৩ = ২! তাই উত্তর ২!

৮ ভূত ছিল, ৫ ভূত লুকালো। কয়জন দেখা যাচ্ছে?

ভূতান ভূত বলল- ৮ - ৫ = ৩! তাই উত্তর ৩!

সব ভূত হেসে উঠল!

ভূতু বিয়োগ বুঝে ফেলেছে। এবার যোগ শিখতে হবে!

স্যার বললেন- তোমরা জানো, ভূতেরা কখনও কখনও এক হয়ে যায়!

ভূতু ভূত বলল- মানে?

স্যার বোর্ডে আলো দিয়ে লিখলেন-

এক ভূতের সাথে,

আরেক ভূতে এল!

একটি, দুটি, তিনটি হলো!

সবাই একসঙ্গে বলল-

১ + ১ = ২!

ভূতু ভূত এবার আরও একটা পরীক্ষা করল- যদি ৪ ভূত আর ৩ ভূত এক হয়, তাহলে কয়জন হবে?

ভূতান ভূত বলল- ৪ + ৩ = ৭!

এবার ক্লাসে একটা নতুন বিষয় শেখানো হবে- গুণ! ভূতু ভূত খুব উত্তেজিত, কারণ সে শুনেছে, গুণ নাকি যোগের চেয়েও জাদুকরী!

স্যার বোর্ডে আলো দিয়ে লিখলেন- যোগ দিয়ে দ্রুত সংখ্যা বাড়াতে চাইলে কী করব?

ভূতান ভূত বলল- একটা সংখ্যা বারবার যোগ করব!

স্যার হেসে বললেন- ঠিক তাই! আর সেটাকেই বলে গুণ!

স্যার বোর্ডে লিখলেন- ২ + ২ + ২ + ২ = ?

ভূতু বলল- এটা তো ৮!

স্যার বললেন– দেখো, এটা সহজভাবে লিখলে হয় ৪ × ২ = ৮!

ভূতু অবাক! এতক্ষণ যে যোগ করছিল, সেটা গুণ দিয়ে এক ধাপেই করা গেল!

ভূতান ভূত একটা প্রশ্ন করল- তাহলে যদি ৩ ভূত একসঙ্গে ৫ বার দাঁড়ায়, তাহলে কতজন হবে?



সবাই ভাবতে লাগল। ভূতু এবার বুঝে ফেলেছে, সে বলল- ৩ × ৫ = ১৫! তাই মোট ১৫ ভূত দাঁড়াবে!

স্যার বললেন- দারুণ! এবার তোমরা আরও কঠিন গুণ করতে পারবে!

গুণ শিখতে ভূতেরা বেশ মজা পাচ্ছিল, কিন্তু স্যার হঠাৎ বললেন- এবার শিখবে ভাগ!

ভাগ শুনে ভূতু ভূত কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল! সে বলল- স্যার, ভাগ মানে তো ভাগ হয়ে যাওয়া! যদি আমি ভাগ হয়ে যাই?

সব ভূত হাসতে লাগল!

স্যার বললেন- ভাগ মানে হারিয়ে যাওয়া নয়, বরং সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া!

ভূতু ভূত বুঝল না। তখন স্যার বোর্ডে লিখলেন- ১২ ভূত যদি ৪ দলে ভাগ হয়, তাহলে প্রতিটি দলে কয়জন থাকবে?

ভূতান ভূত বলল- একটু ভাবতে দাও যদি ১২ ভূতকে ৪ দলে ভাগ করি, তাহলে ১২ ÷ ৪ = ৩! তাই প্রতি দলে ৩ ভূত থাকবে!

ভূতু এবার বুঝতে পারল- ভাগ মানে হলো সমানভাবে বণ্টন করা!

ভূতু বলল- আচ্ছা, যদি ভূতেরা ভাগ হয়, কিন্তু সমানভাবে না হয়?

স্যার বললেন- ভালো প্রশ্ন! তাহলে কিছু ভূত বাকি থেকে যাবে! একে বলে ভাগশেষ!

স্যার বোর্ডে লিখলেন- ১৩ ÷ ৫ = ?

ভূতান ভূত বলল- ৫ দিয়ে ১৩ পুরোপুরি ভাগ হয় না! ৫ × ২ = ১০ হয়, কিন্তু ১৩ হলে আরও ৩ থেকে যায়!

স্যার বললেন- তাই উত্তর হবে ভাগফল ২। কিন্তু ভাগশেষ হবে ৩!

ভূতু ভূত খুশি হয়ে বলল- ওহ! তাহলে ভূতেরা যদি একসঙ্গে ভাগ হয়, কিছু ভূত লুকিয়ে যেতে পারে!

সব ভূত হেসে উঠল! এবার ভূতপুরের সবাই গুণ-ভাগ পুরোপুরি শিখে ফেলেছে!

দুই

আজ ভূতপুর স্কুলে এক নতুন উত্তেজনা! আজ তাদের গণিত শেখার শেষ ক্লাস। গোল ভূত, ত্রিভুজ ভূত, বর্গ ভূত আর ভূতু ভূত সবাই চুপচাপ বসে রয়েছে। আরো একটা কারণ আজ অঙ্ক পরীক্ষা!

স্যার রহস্যময়ভাবে বললেন- আজ তোমরা শেষ পরীক্ষায় বসবে, কিন্তু মনে রেখো, এই পরীক্ষায় শুধু গণিতের গোপন রহস্য রয়েছে!

সব ভূত একসাথে বলল, গোপন রহস্য! কী কী রহস্য?

স্যার বললেন— আজকের পরীক্ষা হবে তিনটি ধাপে। প্রতিটি ধাপে তোমরা গাণিতিক সমস্যার সমাধান করবে। যদি সমাধান সঠিক হয়, তবে পরবর্তী ধাপে পৌঁছাবে। কিন্তু যদি ভুল হয়, তাহলে তোমরা ফিরে আসবে!

প্রথম ধাপ: ভূতু ভূতের ভাগফল!

স্যার প্রথম প্রশ্নটি দিলেন— একটা সংখ্যা আছে, তার সাথে ১২ যোগ করলে ৩৬ হয়। তারপর ওই সংখ্যাটি ৪ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায়। সেই সংখ্যা কী?

ভূতু ভূত মাথা চুলকে বলল, এটা কীভাবে সমাধান করব?

গোল ভূত বলল- ও! আগে ১২ যোগ করার পরে, সংখ্যাটা ৩৬ - ১২ = ২৪ হবে! এখন ৪ দিয়ে ভাগ করলে, ২৪ ÷ ৪ = ৬! তাহলে সংখ্যাটা ৬!

স্যার বললেন, দারুণ! এখন পরবর্তী ধাপে যাও!

দ্বিতীয় ধাপ: সমান্তরাল রেখা!

স্যার এবার একটা নতুন ধাঁধা দিলেন- তিনটা সমান্তরাল রেখা আছে- অ, ই, ঈ। যদি অ + ই = ঈ হয় এবং ই + ঈ = অ হয়, তাহলে অ, ই, ঈ এর মান কী?

ত্রিভুজ ভূত ভাবল। এটা তো একটা ধাঁধা!

এবার বর্গ ভূত বলল, তাহলে অ, ই, ঈ এর মান হবে শূন্য! যদি অ + ই = ঈ হয়, আর ই + ঈ = অ হয়, তাহলে অ, ই, ঈ এর মান ০ হতে হবে!

স্যার বললেন, 'অসাধারণ! তুমি সঠিক উত্তর দিয়েছ'!

তৃতীয় ধাপ: ভূতু ভূতের গতি!

এবার স্যার শেষ প্রশ্নটি দিলেন- একটি ভূত যদি এক সেকেন্ডে ১০০ মিটার চলে, তবে সেই ভূত ৩০ সেকেন্ডে কত মিটার যাবে?

ভূতু ভূত ভয় পেয়ে বলল, এটা সহজ! যদি এক সেকেন্ডে ১০০ মিটার চলে, তাহলে ৩০ সেকেন্ডে যাবে ৩০ × ১০০ = ৩০০০ মিটার!

স্যার বললেন, অত্যন্ত সুন্দর! এখন তোমরা সবাই উত্তীর্ণ!

ভূতুদের অঙ্ক পরীক্ষা শেষ!

স্যার বললেন, আজকের পরীক্ষা শেষে ভূতপুর রাজ্যে তোমাদের নাম উঠবে সেরা গণিত ভূত হিসেবে!

সব ভূত আনন্দে চিৎকার করল, জয় ভূতপুর! ❑

শিশুসাহিত্যিক

ভূত কেমন

মো. কাওসার আহমেদ

ভূতটা কেমন? সাদা-কালো
মেঘের মতো হালকা ভালো
চুলগুলো তার উলটো দিকে
হাওয়ায় উড়ে ডান-বাম দিকে।

চোখ দুটো গোল, জ্বলজ্বলে
হাসে সে খুব টলমলে।

মুখটা তার চাঁদের মতো
ভয় নেই, বরং হাসি যত
গলায় ঝুলে ঘণ্টা ছোটো
টুনটুন বাজে অনবরত।

দ্বাদশ শ্রেণি, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ

ভূতুড়ে বাড়ি

মো. আব্দুল কুদ্দুছ



পুরনো সেই বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ,
জানালায় ঝুলে আছে ছেঁড়া নীল পর্দার ছাপ।
দরজাটা কাঁপে রাতে অকারণে হাওয়ায়,
কেউ যেন হাঁটে ভাঙা সিঁড়ির ছায়ায়।

চাঁদের আলো ঢোকে ফাঁকা ঘরের ভেতর,
দেয়ালে ছায়ারা নাচে অদ্ভুত এক ঘোর।
হঠাৎ কোথা থেকে ভেসে আসে দীর্ঘশ্বাস,
মনে হয় কেউ যেন দিচ্ছে আশ্বাস।

আঙিনাতে শুকনো পাতা শব্দ তোলে ধীরে,
কেউ কি লুকিয়ে আছে অন্ধকারের নীড়ে?
পুরনো দোলনাটা দুলে ওঠে আপন মনে,
গোপন ক্ষণে কারা বসে দোলে সেখানে?

মামদো ভূতের ছানা

ফারহানা খান

আমবাগানে থাকে নাকি
মামদো ভূতের ছানা।
ভূতের ছানার কুড়িটা চোখ
আছে দেড়শ ডানা।

শ'দুয়েক পাও আছে
বিশাল পায়ের ছাতি।
ভূতের ছানা রোজ নাকি খায়
আস্ত একটা হাতি।

ভূতের ছানা কে দেখেছে
কোথায় বা পায় হাতি?
যুগে যুগে গল্প শুনেই
আমরা সবাই মাতি।

জঙ্গলের কালো ছায়া

মো. মাহবুবুর রহমান

ঘন জঙ্গলে চাঁদের আলো ম্লান
গাছেরা দাঁড়িয়ে যেন অচেনা প্রাণ
ঝোপের আড়ালে ফিসফিস শব্দ
কে যেন ডাকে অদ্ভুত ছন্দ।

হঠাৎ কেঁপে ওঠে শুকনো ডাল
কেউ কি হাঁটছে নীরব কাল?
চোখ দুটো জ্বলে অন্ধকারে
দেখে মনে হয় আগুন জ্বলে।

প্যাঁচার ডাক ভেসে আসে দূরে
ভয় ঢুকে পড়ে বুকের ভেতরে
পথ হারিয়ে যায় কুয়াশার মাঝে
ছায়ারা নড়ে গোপন সাজে।

ভূতের বাড়ি

আব্দুল্লাহ আল মুহসিন

বাড়ির পাশে আছে একটা
বিরাট ভূতের বাড়ি
সেথায় তারা বাস করে
মাথার চুল ছাড়ি।

সন্ধ্যা হলে সেখান থেকে
ভূতের আওয়াজ আসে
আগুন মুখো কালো ভূত
খিলখিলিয়ে হাসে।

হঠাৎ দেখি একটা ভূত
নদীর তীরে গেল
লম্বা হাতে নদী থেকে
মাছ নিয়ে এল।

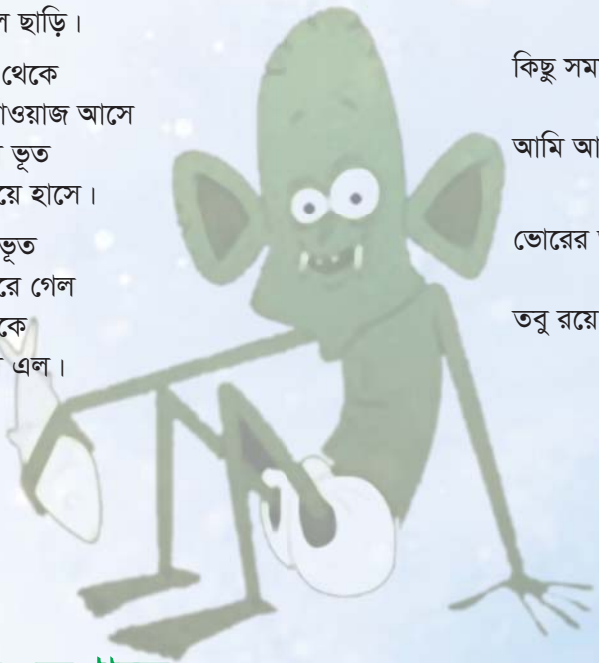

কেউ নেই সেখানে

মো. আরিফুর রহমান

গ্রামের শেষে বাঁশঝাড় পেরিয়ে
একটা পথ যায় নদীর ধারে
লোকজন যায় না সন্ধ্যার পর
শোনা যায় সেখানে কান্নার স্বর।

শুকনো ধূপের গন্ধ ভাসে
কে যেন বসে অন্ধকারে পাশে
চিতা নিভে গেছে বহুকাল আগে
তবুও মাঝে মধ্যে জ্বলে ওঠে।

পদশব্দ শুনি পেছন পানে
ফিরে দেখি কেউ নেই সেখানে।

নিশির ডাক

মো. তাজুল ইসলাম তপন

ঘরের ভেতরে বাতি
নিভে যায় হঠাৎ,
অন্ধকার ঘিরে ধরে
হয়ে যাই চিৎপাত।

কিছু সময় পরে
অনুভব করি শরীরে,
আমি আছি বাহিরে
শীতল স্পর্শে জড়িয়ে,

ভোরের আলো ফুটতেই দেখি,
ঘরে আমি একাই আছি।
তবু রয়ে যায় সেই শীতল স্মৃতি,
নিশির ডাকের অতিথি।

রহস্যময় রাত

মো. রনি আহমেদ

অন্ধকার রাতে কে যেন ডাকে
অদৃশ্যে শোনা যায় ফিসফাস
শরীরে বয়ে যায় ঠান্ডা বাতাস
রাতে শোনা যায় দীর্ঘশ্বাস।

সাদা কাপড় উড়ে যায় হাওয়ায়
মনে হয় কেউ দাঁড়িয়ে দাওয়ায়
চোখ মেলে তাকালে অদৃশ্যে দেয় ঝাঁপ
মনের মধ্যে রেখে যায় শুধু ভয়ের ছাপ।

তবুও সেই পথে চাঁদের রাতে
রহস্য ডাকে গোপন সুরেতে
ভয় আর কৌতূহল পাশাপাশি রয়
রহস্যময় রাত কত গল্পময়।



মামদো ভূতের জাদুর পুকুর

শুভ জিত দত্ত

আমার স্কুলের সব থেকে প্রিয় বন্ধু রাজু। স্কুলে আমরা দু'জন যেন মানিকজোড়। দুজনে একসাথে বসা থেকে শুরু করে টিফিনের খাবারও ভাগ করে খেতাম। আমার সব থেকে প্রিয় খাবার ছিল খিচুড়ি আর মুরগির মাংস। যার কারণে রাজুর মা মাঝে মাঝেই টিফিনে এগুলো পাঠাতেন। রাজু পড়াশোনায় যেমন ভালো ছিল তেমন খেলাধুলায়ও ছিল খুব ভালো।

আবার ইংরেজি-অঙ্কের কঠিন হিসাবগুলোও রাজুর কাছে বুঝে নেওয়া- এই নিয়েই ছিল আমাদের সুন্দর দিনগুলো। রাজুদের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে নয়। স্কুলে যাওয়ার পথে প্রতিদিন রাজুর জন্য অপেক্ষা করতাম। দু'জনে একসাথে হই-হুল্লোড় করতে করতে স্কুলে যেতাম। আমাদের স্কুলের ঠিক পেছনেই একটা ঘন জঙ্গল আছে। সেই জঙ্গলের বুক চিরে কিছুটা পথ এগোলেই এক পুরনো জমিদার বাড়ি। বাড়ির গা ঘেঁষে একটা বিশাল পুকুর। ঠাকুমার মুখে শুনেছি, সেই পুকুর নিয়ে অনেক রহস্য। ঠাকুমা বলেছিলেন ওখানে যদি কোনো খারাপ মানুষ

যায় তাহলে তাদের ক্ষতি হয়, তবে ভালো মানুষ গেলে তাদের কিছু হয় না। একদিন টিফিনের ছুটিতে সাহস করে আমরা রওনা দিলাম সেই পুকুরপাড়ে। জঙ্গলের বুক চিরে কিছুটা এগোতেই চোখে পড়ল সেই বিশাল জমিদার বাড়ি। জীর্ণ দেয়াল আর শ্যাওলা ধরা থামগুলোয় যেন কতকালের কথা লুকিয়ে আছে। সেখানে পৌঁছাতেই আমাদের চোখ ছানাবড়া! পুকুরের জল আয়নার মতো পরিষ্কার, আর ভেতরে খেলছে অদ্ভুত সব রঙিন মাছ। হঠাৎ এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটল। মুহূর্তের মধ্যে বনের ধূসর গাছপালাগুলো উজ্জ্বল রঙে সেজে উঠল। ডালপালা ভরে গেল রং-বেরঙের পাখিতে। একটা রুপালি মাছ হঠাৎ করে জল থেকে শূন্যে ভেসে উঠল! বাতাসে ভাসতে ভাসতে সে ডানা মেলল আর মাছটি এক অদ্ভুত সুন্দর অবয়ব নিল।

আমাদের চমকে দিয়ে সে মিষ্টি গলায় কথা বলে উঠল, 'ভয় পেও না বন্ধু! আমি এই পুকুরের রক্ষক-মামদো। আমি তোমাদের মতোই একজন খেলার সাথি খুঁজছিলাম এতদিন ধরে।' মামদোর কথা শুনে আমাদের ভয় এক নিমিষেই আনন্দে বদলে গেল। মামদো হাসিমুখে বলল, 'তোমাদের কী খেতে ইচ্ছে করছে বলো তো?' রাজুর চকলেট দারুণ প্রিয়, আর আমার জিভে জল আসে রসগোল্লা দেখলে। মামদো শুনতেই হাতটা শূন্যে একটু ঘোরালো। অমনি জাদুর মতো আমাদের সামনে হাজির হলো পাহাড় প্রমাণ চকলেট আর ধোঁয়া ওঠা গরম মিষ্টি! আমি আর রাজু তো খুব মজা করে খেলাম। তারপর ফেরার সময় সঙ্গে নিয়ে এলাম কিছু। এরপর সে জাদুর গালিচায় উঠিয়ে আমাদের অনেক দেশ ঘোরালো। আমরা মজা করে তা উপভোগ করছিলাম। মামদো ভূতের একটাই দাবি মাঝে মাঝে তার সঙ্গে খেলতে আসতে হবে। তাহলে সে আমাদের অনেক মজার মজার খাবার খাওয়াবে। কিন্তু এই কথা কাউকে বলা যাবে না, বললে কিন্তু জাদুর পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর থেকে ছুটি পেলেই মামদো ভূতের সাথে গল্প করতে আর খেলতে যেতাম। আর মামদো ভূত আমাদের জন্য অপেক্ষা করে একরাশ জাদু আর আনন্দ নিয়ে। আমাদের বন্ধুত্বের এই রঙিন রহস্যটা কেবল আমরা দু'জন আর আমাদের পরম বন্ধু মামদো ভূত ছাড়া আর কেউ জানে না। ❑

গল্পকার

মামদো ভূতের ছানা

মামুন সরকার

বাঁশের ঝাড়ে আছে নাকি
মামদো ভূতের ছানা,
রাত গভীরে দেখলে মানুষ
বানায় নাকি খানা।

যাদের মনটা ভীষণ মন্দ
পেলে তাদের কাছে,
এক পলকে ঘাড়টা মটকে
লটকে রাখে গাছে।

যেসব মানুষ লোকের কানে
কুমন্ত্রণা দেয়,
ভূতরা যেন সকল সময়
তাদের পিছুই নেয়।

ন্যায়ের পথে যারা চলে
মনটা দুধেল সাদা,
ভূতের দল সম্মান দিয়ে
ডাকে তাদের দাদা।



তেঁতুলতলির ভূত



মুহাম্মদ রফিক ইসলাম

গ্রামের নাম গন্ডা। ওই গ্রামের দক্ষিণ মাথার একটি মোড়ের নাম তেঁতুলতলি। মোড়টার নাম শুনলেই কেমন জানি ভয় ভয় লাগে। এর চেয়েও ভয়ংকর বিষয় হলো ওই মোড়ে বেড়ে ওঠা তেঁতুল গাছটি। বেশ বড়োসড়ো। ঘন পাতায় মোড়ানো। নিচে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে সূর্য দেখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

তেঁতুলতলির মোড়ের এই তেঁতুল গাছটির সাথে ভূতবিষয়ক বিভিন্ন ঘটনার সাথে শুধু গন্ডা গ্রামের মানুষ পরিচিত তা নয় বরং আশপাশের দু'চার গাঁয়ের মানুষের মুখে মুখেও কম বিস্ময়ের কথা ছিল না। গ্রামের মুরুব্বি শ্রেণির পুরুষের অনেকেই তেঁতুল গাছের ভূতের সাথে সরাসরি মোকাবেলা করেছেন বলে কথিত রয়েছে। তেমনি

একজন ছিলেন কেরামত আলী দাদু। তাঁর বয়স সত্তরের কোটায়। প্রায় বিকেলেই তাঁর সাথে ঘটে যাওয়া ভূতবিষয়ক বিভিন্ন গল্পের আড্ডা জমিয়ে তোলেন তিনি। এজন্য পাড়ার ছেলেপুলে অনেকের কাছেই তিনি ভূত দাদু হিসেবে পরিচিত।

সেদিন মঙ্গলবার। ভূত দাদু নতুন কিছু বলবেন। ছেলেপুলেরা জমায়েত হয়েছে পূর্বের স্থানে, বটতলায়। বটতলা জায়গাটি গন্ডা গ্রামের উত্তর পাশে, পোড়াবাড়ির সামনের দিকে। চারিদিকে খোলা মাঠ, অবারিত প্রান্তর। দক্ষিণের হীমবায়ু বয়ে চলে উত্তর দিকে।



ছেলেপুলেরা গোল পাকিয়ে বসল। ভূত দাদু মধ্যমণি। বেশ মোটাসোটা মানুষ। চুলদাড়ি পাকা। চোখ দুটো যেন গর্তের আঁধারকে উজ্জ্বল করে তোলে। গল্প বলার সময় তাঁর চেহারার রূপ পালটে যায়। গলার স্বরেও আসে অদ্ভুত ধরনের পরিবর্তন। যখন চোখ তুলে তাকান তখন মনে হয় বই সামনে রেখে রিডিং পড়ার মতোই গল্পটাকে দেখে দেখেই বলছেন তিনি। ভূত দাদু তাঁর ঝুলি থেকে গল্প বের করে বলতে যাবেন এমন সময় দিনা বলল- ভয়ের গল্প বলো না কিন্তু। রাতে ভয়ে বাইরে বেরোতে পারি না। ঘরের ভেতরেই প্রাণ যায় যায় অবস্থাতে থাকে।

আমি তো সন্ধ্যার পর ঘরে থাকলেও মনে হয় আমার পাশে ভূত দাঁড়িয়ে।

দিনার কথায় বাধা দিয়ে রঞ্জু বলল- ভয়ের গল্পই বলো দাদু। ভূতের গল্পে ভয় না থাকলে আরাম লাগে না। মজাও পাই না! ভূতের গল্পের ভেতর ভয় না থাকলে সেটা কী ভূতের গল্প হয়?

রঞ্জুর কথা শুনে ভূত দাদু এবার আরেকটু সাহস পেলেন। তিনি টিনা ও দিনার দিকে তাকিয়ে বললেন- রঞ্জু ঠিক বলেছে। তাছাড়া ওসব তো গল্প নয়, এক্কেবারে জীবন্ত। আমার জীবনেরই অঙ্ক।

টিনা, দিনা ও রঞ্জু আরেকটু কাছাকাছি বসল। ভূত দাদু বলতে লাগলেন- সেদিন ছিল শনিবার। রাতে আমি বাজার থেকে গজার মাছ নিয়ে বাড়িতে ফিরছিলাম। তেঁতুল গাছটার গোড়ায় যেই আসলাম, অমনি ব্যাগের ভেতর রাখা মৃত গজার মাছটা লাফাতে শুরু করল। আমি ব্যাগটা চেপে ধরতেই তেঁতুল গাছের একটা ডাল মটমট করে ভেঙে পড়ল আমার সামনে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মাথাহীন একটা ভূতের ধড়ের এক পা গাছে আরেক পা গাছের ডালের ওপর। কঙ্কালের মতো হাতগুলো বাড়িয়ে ধরল আমার হাতের ব্যাগটার দিকে। আমি বাঁধা দিলাম। ব্যাগটাকে নিতে দিলাম না। ওই ভূতের পাশে থাকা আরেকটা ছোটো ভূত ব্যাগটা ধরে এমন জোরে টান দিল...।

দাদুর কথা শুনে টিনা দিনাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে লাগল। রঞ্জু ভয় পেলো না মোটেও। সে আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করল- তারপর? ওই ছোটো ভূতটা দেখতে কেমন ছিল, দাদু?

খুব বিশ্রী! ওর মুখ বলতে কিছুই ছিল না। ইয়া বড়ো একটা নাক ছিল। নাকের উপরের দিকে ছিল একটা মাত্র চোখ। চোখটা বলের মতো ঘুরাতে লাগল আর তখনি চোখ থেকে টর্চলাইটের আলোর মতো ঘন আলো বেরোতে লাগল।

ভূত দাদুর গল্পের দিকে রঞ্জুর আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। টিনার দিকে তাকিয়ে দিনা বুকে থুথু দিয়ে কী

যেন মন্ত্র পড়ে বুকে ফুঁ দিল। পাশ থেকে রঞ্জু বলল- দাদু, ব্যাগটা কি নিয়েই গেল শেষমেষ? ফেরাতে পারলে না?

আমি কি ছাড়ার মানুষ নাকি? পিচ্চি ভূতটাকে খপ করে ধরে ফেললাম এবং ব্যাগটা জোর করে ছিনিয়ে নিলাম। ভূত দাদু মুচকি হাসি হেসে এক ধরনের বীরত্বের সাথে উত্তর দিলেন।

টিনা চোখ বড়ো বড়ো করে জিজ্ঞেস করল- জোরে টানায় ভূতছানাটা ব্যথা পায়নি? ওর মা বুঝি কান্নাও করেছিল?

সে আর বলতে হয়? জোরে টান খেয়ে ওটা পড়ল গিয়ে একটা ঝোপের ভেতর! আর মায়ের সে কি কান্না! এক ধরনের চেং চ্যাং ভাষায়। মজার ব্যাপার কী জানো?

কী? সবাই সমস্বরে জানতে চাইল।

সঙ্গে সঙ্গে চন্ডী, চারাল, শাঁকচুন্নি, মামদো হরেক রকমের ভূত এসে হাজির হলো। ওদের সাথে আসলো হিহিহি করে হাসতে হাসতে একঝাঁক কঙ্কালও!

মাগো! ভূত!

রঞ্জুর এমন ভয়ংকর চিৎকার শুনে সবাই চমকে উঠল। ততক্ষণে টিনা ও দিনা ভূত দাদুকে গল্প থামাতে বলে রঞ্জুর দিকে এগিয়ে গেল। ওর গায়ে হাত দিতেই সে আরও জোরে চিৎকার করতে লাগল। সবাই রঞ্জুর এ দশা দেখে ভয় পেয়ে গেলে রঞ্জু অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে দাদুর দিকে তাকিয়ে বলল- দাদু আজ থাকুক। ওদেরকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি। আগামী দিনে আজকের শেষ জায়গা থেকে শুরু করা যাবে।

কেরামত আলী দাদু ওরফে ভূত দাদু মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ-সূচক সম্মতি দিয়ে বললেন- বেলা পড়ে এল। যার যার বাড়ি ফিরে যাও। হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসো গিয়ে। তা না হলে আগামীকাল থেকে আর কোনো গল্প বলব না কিন্তু! সকলেই দাদুর কথা মেনে নিয়ে উঠে গেল। বাড়িতে ফেরার পথে সবার পিছনে থাকল কেরামত আলী দাদু। ❑

গল্পকার





নিশির ডাক

নারায়ণ চন্দ্র মণ্ডল

গ্রামের পথে কুয়াশা নামে,
রাতটা যেন থমকে থামে।
দূর থেকে ভেসে আসে মিষ্টি সুর,
এক পরিচিত কণ্ঠ সুমধুর।

নাম ধরে ডাকে মিষ্টি স্বরে,
শুনলেই মন যায় কেমন করে।
বুড়োরা বলে, শুনিস না ভাই,
নিশির ডাকে সাড়া দিতে নাই।

সামনে দেখি সাদা শাড়ি,
মুখটা তার অদ্ভুত ভারী।
চোখ দুটো জ্বলে জ্বলজ্বল,
হাসিটা দেখলে মন হয় চঞ্চল।

পেছন ফিরে দৌড়াই শেষে,
কিছুক্ষণ পর জ্ঞান হারাই নিমিষে
জ্ঞান ফিরে দেখি নিজেরই ঘরে
সবাই বলে নিশি ডেকেছিল তোরে।

নবারুণ বন্ধুদের জন্য কিছু ভূতের চলচ্চিত্র ও বইয়ের নাম




রফিকুর রশীদ
ভূতের যত ভয়
ছোটদের ভূত
আহসান হাবীব
ভুতুড়ে ট্রেন
বিশ্বজিৎ দাস
পক্কে নাচে পক্কা ভূত
বিএম বরকতউল্লাহ
গল্প গাঁথায় ভূতের কমিকস
৭ ভূতের কাণ্ড
ভূতের বাবার জন্মদিন
চিন্ময় কুমার মল্লিক
ছোটদের ভূত
আনিসুল হক
ভেজাল ভূতের গল্প
সঞ্জয় কুমার দাস
হুমায়ূন আহমেদ
ভূত ভূত ভূত

কে?

সাইফান মাসুদ আলী



বর্ষাকাল, বৃষ্টি হচ্ছিল, স্যাঁতস্যাঁতে একটা আবহাওয়া ছিল। বিপুর মা-বাবা সেদিন বাসায় ছিল না। সে তার ঘরের ভেতর পড়ার টেবিলের কাছে একটা চেয়ার নিয়ে বসেছিল। বাহিরে আবছা আবছা একটা আলো তার ঘরে ঢুকছিল। জানালায় ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির পানি পড়ছিল।

সে জানালার দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ তার মনে হলো কে যেন তাকে ডাকছে। সে একটু ভয় পেল, ক্ষীণ গলায় বলল কে? কে? কে? তার মনে হলো তার পাশ দিয়ে একটা দমকা হাওয়া চলে গিয়েছে। তার গলা শুকিয়ে আসছিল। সে খেয়াল করল, তার খাটের পাশে যে দাবার গুটিগুলো সাজানো ছিল সেগুলো নিজে নিজে চলছে। তার মনে হচ্ছিল তার কাঁধে কেউ হাত রেখেছে। তখন চোখ ঘোলা হয়ে আসলো। সে চাইলেও নড়তে পারছিল না। তার চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। আর তখনই একটা চিৎকারের আওয়াজ বিপুদের বাড়ির চারপাশের গাছপালা নাড়িয়ে দিলো। ❑

ষষ্ঠ শ্রেণি, নালন্দা উচ্চ বিদ্যালয়

বাংলাদেশের ভৌতিক কিছু জায়গা

পৃথিবীতে এমন অনেক বিষয় বা ঘটনা রয়েছে যার ব্যাখ্যা এখনো মেলেনি। বিষয়গুলোকে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়। অলৌকিকতার প্রতি মানুষের আগ্রহ শুরু থেকে। আর তা যদি হয় জীন-ভূতকে ঘিরে তাহলে মানুষের আগ্রহের কমতি নেই। আমাদের দেশে এমন কিছু জায়গা রয়েছে যা ভৌতিক স্থান হিসেবে পরিচিত। এসব স্থানে গেলে ভূতের দেখা মিলবে কি মিলবে না তা বলা না গেলেও, ভয়ে শরীরের লোম দাঁড়াবে অবশ্যই। বন্ধুরা, চলো জেনে নেওয়া যাক এমন কিছু ভৌতিক স্থান সম্পর্কে-

মঙ্গলপুর

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নে অবস্থিত মঙ্গলপুর একটি ঐতিহাসিক ও রহস্যে ঘেরা জনমানবহীন গ্রাম। উপজেলা শহর থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গ্রামটি। যার নাম মঙ্গলপুর। বিশ্বাসই হবে না এই গ্রামে সবই আছে, শুধু মানুষের বসবাস নেই। অনেকে বলেন, ভূতুড়ে গ্রাম বা ভূতের গ্রাম। গ্রামে ঢুকলেই গা ছমছম করে। কেউ বলে আশি বছর আবার কেউ বলে শত বছর



আগেই গ্রামটি জনশূন্য হয়ে পড়ে। ইউনিয়ন ভূমি অফিস সূত্রে জানা যায়, প্রায় এক বর্গকিলোমিটার আয়তনের এ গ্রামে এখনো রাতে মানুষ ঢোকে না কোনো এক অজানা ভয়ে। এলাঙ্গী ইউনিয়নের ৬৬ নম্বর মৌজায় অবস্থিত গ্রামটি। কথিত আছে, এই গ্রামে একসময় অনেক মানুষ বসবাস করত। যার অধিকাংশ মানুষ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। কিন্তু হঠাৎ গ্রামে মহামারি আকারে কলেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু মানুষ মারা যায়। তখন সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করে গ্রামে অমঙ্গল কিছুর প্রবেশ হয়েছে। গ্রামের মানুষ অন্যত্র যেতে শুরু করে। কেউ আবার ভারতে চলে যায়। তখন থেকে একেবারেই শূন্য হয়ে যায় মঙ্গলপুরে মানুষের বসবাসের কোটা।

চিকনকালা (নিফিউ পাড়া)

মুরং গ্রামটা বাংলাদেশ-বার্মা নো ম্যানসল্যান্ডে। সম্পূর্ণ স্থানটিই ঘন ঝোপঝাড়ে ঘেরা। জায়গাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দৃশ্য সত্যিই আশ্চর্যজনক সঙ্গে কিছুটা ভয়ংকরও। অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে সেখানে গিয়ে থাকেন।



তবে জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ করার সাহস কেউ দেখায় না। সবাই ভূতুড়ে জায়গা হিসেবে বিবেচনা করে। কথিত আছে, সেই অঞ্চলের স্থানীয়রা ভ্রমণকারীদের সেখানে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। তারা বিশ্বাস করে যে জঙ্গলে কিছু অশুভ শক্তি রয়েছে। প্রায়ই শোনা যায় জঙ্গল থেকে ভেসে আসা অদ্ভুত ও রহস্যজনক কিছু শব্দ। সাধারণত বছরে একবার হলেও সন্ধ্যায় জঙ্গলে এ অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী, যেদিন ভূতেরা ঘুম থেকে জেগে উঠে সেদিন এ ধরনের শব্দ শোনা যায়। শব্দ শুনে আতঙ্কে জঙ্গলে থাকা কাঠুরে

ও শিকারির দল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোকালয়ে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে দলের দুই একজন যদি কোনো কারণে জঙ্গল থেকে বের হতে ব্যর্থ হয় তাহলে কিছু দিন পর তাদের মরদেহ বনের ভেতরে পাওয়া যায়। এখানে অবাক করা একটি বিষয় হলো, মৃত ব্যক্তিদের শরীরে কোথাও কোনো দাগের চিহ্ন পাওয়া যায় না। তাই তাদের মৃত্যু সম্পূর্ণ রহস্যের মধ্যেই রয়ে যায়। এভাবে প্রতি বছরই গড়ে এক থেকে চারজন এ জঙ্গলে রহস্যজনক মৃত্যুর শিকার হয়। এ কারণে স্থানীয়রা সন্ধ্যার পরে জায়গাটিকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন।

লালবাগ কেল্লা



লালবাগ কেল্লার নিচ দিয়ে অনেকগুলো সুড়ঙ্গ আছে, যেগুলো জমিদার আমলে করা। জমিদাররা বিপদ দেখলে সেইসব পথে পালিয়ে যেত। অনেক সুড়ঙ্গের মাঝে এমন একটা সুড়ঙ্গ আছে, যার ভেতরে কেউ ঢুকলে তাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না। কেউ বলে সুড়ঙ্গটি এখান থেকে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত, আবার কারো মতে এটি টঙ্গী নদীতে গিয়ে পড়েছে।

বৃটিশ আমলে একবার একটি অনুসন্ধানী দল দুটি কুকুরের গলায় চেইন বেঁধে তাদের সুড়ঙ্গের ভেতরে পাঠায়। একটু পর চেইন ধরে টান দেওয়া হলে চেইন দুটি ফেরত আসলেও কুকুরগুলোর নাম নিশানা পাওয়া যায়নি। এরপর কিছু হাতিও সেখানে পাঠানো হয়। বলাবাহুল্য, সেগুলোরও কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার পর বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ওই সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই সুড়ঙ্গ আজও বন্ধ। কী লুকিয়ে আছে ওই বন্ধ দরজার ওপারে তা এখনো মানুষের জানা নেই। তবে সব মিলিয়ে লালবাগ কেল্লা শুধু ইতিহাসেরই না, বরং রহস্যেরও আধার বটে।

আলিয়াপুর গ্রাম

চুয়াডাঙ্গার আলিয়াপুর নামক গ্রামে নাকি প্রতি অমাবস্যায় রাত ১২টা থেকে রাত ৩টা পর্যন্ত একদল কুকুর দলবেঁধে গ্রামটি ঘিরে চক্কর দেয়। অনেকেই সেই কুকুরের দলকে দেখতে পেয়েছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তারা শুধুমাত্র অমাবস্যার রাতেই উপস্থিত হয় এবং সারা মাসে তাদের আর দেখা যায় না। কয়েকজন যুবক মিলে একবার রাত করে তাদের দেখার জন্য প্রস্তুতি নেয়। তাদের মাঝে ২জন কুকুরের কামড়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়। যুবকদের প্রায় সকলেই একই স্বীকারোক্তি দেয় যে, সেই সব কুকুরগুলো কালচে বর্ণের ছিল, কারণ অন্ধকারে তাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। তারা একটা ছন্দ মিলিয়ে এক লাইনে হাঁটছিল এবং তাদের প্রত্যেকের চোখ থেকেই এক প্রকার নীলচে আভা বের হচ্ছিল।

মনিপুরীপাড়া

ঢাকার তেজগাঁও এর মনিপুরীপাড়া এলাকায় একটা পুরনো খ্রিস্টান বাড়ি আছে। এই বাড়িতে ভাড়া থাকা প্রায় সব ভাড়াটিয়াই বিভিন্ন অদ্ভুত বা ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানার সম্মুখীন হন। অনেক সময়ই গভীর রাতে (রাত ১-২টার দিকে) বাড়িটার নিচের উঠোনের দোলনায় কাউকে দুলতে দেখা যায়। ঘটনাটি দেখেছেন এমন লোকের সংখ্যা নেহায়েত



কম নয়। এছাড়াও বাড়ির ছাদে অনেক সময় নাকি গভীর রাতে কারা হইচই করে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ছাদে গেলেও কাউকে দেখা যায় না। এই বাড়িটিকে ঘিরে লোকমনে কৌতূহলের কোনো শেষ নেই।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

গ্রামবাংলার ভূত

বাংলাদেশের গ্রামবাংলার আনাচে কানাচে রয়েছে অসংখ্য ভূত। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে বাংলাদেশের মতো এত ভূত নাই। চলো বন্ধুরা পরিচিত হই আমাদের দেশের নানাপ্রকার ভূতের সাথে।

গেছোভূত: গেছো ভূত শব্দটি শুনলেই মনে হয় এরা গাছে বসবাস করে। হ্যাঁ বন্ধুরা এরা সত্যি সত্যি গাছে বসবাস করে। লোকগাথা অনুসারে যেসব ভূতেরা গাছের ডালে থাকে তারাই গেছো ভূত।



বড়ো ঝাঁকালো তেঁতুল গাছ, বটগাছ এদের প্রিয় আবাসস্থল। এদের সম্পর্কে অতি প্রচলিত ধারণাটি হচ্ছে, রাতে যখন কোনো ব্যক্তি একা গাছের নিচ দিয়ে হেঁটে যায়, তখন গেছোভূত গাছে ঝুলে থাকে। আর সেই ব্যক্তিটি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কারো কারো অভিমত অনুসারে এদের শরীরের গঠন অনেকটা বানরের মতো।

মেছোভূত: বুঝাই যাচ্ছে মেছোভূত মানেই এরা মাছ খেতে পছন্দ করে। মেছো শব্দটি বাংলা মাছ থেকে এসেছে। মেছো ভূত সাধারণত গ্রামের কোনো পুকুরপাড়ে বা জলাশয়ের ধারে যেখানে বেশি মাছ পাওয়া যায় সেখানে বসবাস করে। মাঝে মাঝে তারা জেলেদের নৌকা থেকে মাছ চুরি করে খায়। বাজার থেকে কেউ মাছ কিনে গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে রাতে ফিরলে মেছো ভূতেরা তার পিছু নেয় এবং নির্জন বাঁশঝাড়ে বা বিলের ধারে ভয় দেখিয়ে মাছ



ছিনিয়ে নেয়।

জোকা ভূত: এ ধরনের ভূত পুকুর-ডোবা, নদী এবং বিভিন্ন জলাশয়ে বসবাস করে। এদের উচ্চতা কম হয় গায়ের রং সাধারণত কালো হয়।

বেঘোভূত: সাধারণত সুন্দরবন এলাকায় এ ধরনের ভূতের কথা বেশি প্রচলিত। কারণ বাঘের অভয়ারণ্য হলো সুন্দরবন। এসব ভূতেরা জঙ্গলে মধু আহরণে আগত গ্রামবাসীদের ভয় দেখায় এবং মাঝে মাঝে বাঘের স্বরে ডেকে উঠে।

মামদো ভূত: মামদো ভূতেরা বড়ো ও ঝোপালো গাছে বাস করে এবং গাছের নিচ দিয়ে নিরিবিলি সময়ে কেউ গেলে তাদের বিভিন্নভাবে ভয় দেখায় বলে প্রচলিত রয়েছে।

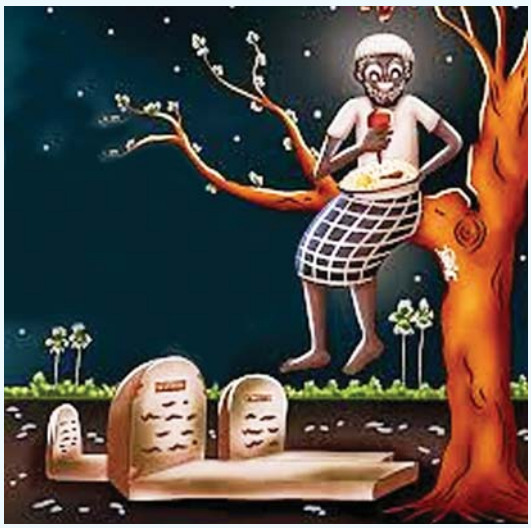

নিশি: ভূতদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হলো নিশিভূত। গভীর রাতে নিশি ভূত কাউকে কাউকে তার

প্রিয় মানুষের কণ্ঠ নকল করে নাম ধরে ডাকে। তার ডাকে সাড়া দিয়ে মানুষ সম্মোহিত হয়ে ঘরের দরজা



খুলে বেরিয়ে পড়ে; আর কখনো ফিরে আসে না। তারা নিজেরাও নিশিতে পরিণত হয়। লোককাহিনি অনুসারে নিশিরা কোনো মানুষকে তিনবারের বেশি ডাকতে পারে না। তাই গ্রাম বাংলায় মনে করা হয় যে কাউকে রাতে তিনবারের বেশি ডাকলে ঘর থেকে বের হওয়া যাবে।

পেঁচাপেঁচি: পেঁচাপেঁচি ভূত ধারণাটি পেঁচা থেকে এসেছে। এরা জোড়া ধরে থাকে ও জোড়ায় শিকার করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জঙ্গলে এদের দেখা যায় বলে বিশ্বাস করা হয়। এরা সাধারণত জঙ্গলে ভ্রমণকারীদের পিছু নেয় এবং আক্রমণ করে ।



কানাভুলো: এ শ্রেণির ভূতেরা পথিকের গন্তব্য ভুলিয়ে দিয়ে ঘোরের মধ্যে ফেলে দেয় এবং অচেনা স্থানে নিয়ে আসে। মাঝে মাঝে মানুষ একই রাস্তায় বারবার ঘুরতে থাকে। এই ভূতরা কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর পর তার উপর ভর করে।

ঝেঁয়ো পেতনি: সাধারণত ঝাউগাছে এরা নিজেদের লুকিয়ে রাখে। ভর সন্ধ্যাবেলায় পথিক যদি একা একা সেই ঝাউবন বা জঙ্গল পার হতে চায়, তখন তাকে ধরে ঝাউয়ের মগডালে চড়িয়ে দেয় এ জাতীয় পেতনিরা।



ডাকিনী: ডাইনি বুড়িদের অনুগতশ্রেণির ভূত। পাতিহাঁস খেতে খুব ভালোবাসে এরা। থাকে পুকুর বা দিঘির ধারে কোনো তাল বা নারিকেল গাছে। রাতদুপুরে মেয়ের বেশ ধরে ঘুরে বেড়ানো এদের অভ্যাস।



ব্রহ্মদৈত্য: এধরনের ভূত সবচেয়ে জনপ্রিয় এরা কারো ক্ষতি করে না। তারা অত্যন্ত দয়ালু ও মানুষকে অনেক উপকার করে থাকে।

আলেয়া: রাতের অন্ধকারে জলাভূমিতে বা খোলা প্রান্তরে আলেয়া দেখা যায়। মাটি থেকে একটু উঁচুতে আগুনের শিখা জ্বলতে থাকে। লোককথায় একে ভৌতিক আখ্যা



দেওয়া হলেও বিজ্ঞানীরা মনে করে গাছপালা পচনের ফলে যে মার্শ (মিথেন জাতীয়) গ্যাসের সৃষ্টি হয় তা থেকে আলেয়ার উৎপত্তি। এর ফলে অনেকে ভুল বুঝে ভয় পায়।

প্রতিবেদন: সরোয়ার আলম

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট



বিশ্ব ভূত দিবস

প্রতি বছর ৩১শে অক্টোবর পালিত হয় বিশ্ব ভূত দিবস বা হ্যালোইন উৎসব। বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশেই পালিত হয় দিবসটি। তবে পশ্চিমা বিশ্বে জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করা হয় হ্যালোইন। হ্যালোইন উৎসব এখন বাংলাদেশেও বেশ পরিচিতি লাভ করেছে।

বন্ধুরা, তোমরা জানলে অবাক হবে, এই ভূতুড়ে উৎসবের ইতিহাস ২০০০ বছরেরও বেশি পুরোনো। অনেকেই ভাবেন, এ দিন হয়ত ভূতের মতো করে সাজতেই পালন করা হয়। আসলে মৃত আত্মাদের স্মরণে পালন করা হয় দিনটি।

হ্যালোইন শব্দের উৎপত্তি ১৭৪৫ সালের দিকে। খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে এর উৎপত্তি। 'হ্যালোইন' বা 'হ্যালোউইন' শব্দটি এসেছে স্কটিশ ভাষার শব্দ 'অল হ্যালোজ' ইভ থেকে। হ্যালোইন শব্দের অর্থ 'শোধিত সন্ধ্যা বা পবিত্র সন্ধ্যা। ২০০০ বছর আগে বর্তমান আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও উত্তর ফ্রান্সে বসবাস করত কেল্টিক জাতি। নভেম্বর মাসের প্রথম দিনটি তারা নববর্ষ বা 'সাহ-উইন' হিসেবে পালন করত।

গ্রীষ্মের শেষ ও অন্ধকার বা শীতের শুরু বলে মনে করত তারা এ দিনটিকে। কেল্টিক জাতির ধারণা ছিল অক্টোবরের শেষ দিনের রাত সবচেয়ে খারাপ। যে রাতে সব প্রেতাত্মা ও অতৃপ্ত আত্মারা মানুষের ক্ষতি করতে পারে। আর তাই কেল্টিক জাতির সদস্যরা এই রাতে বিভিন্ন ধরনের ভূতের মুখোশ ও কাপড় পড়ে সারারাত না ঘুমিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বৃত্তাকারে একসঙ্গে ঘুরত ও মন্ত্র পড়ত। কেল্টিক জাতির এই 'সাহ-উইন' উৎসবই বর্তমানে হ্যালোইন উৎসব হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা



ভূত নিয়ে যত মিথ

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

ভূতের জগৎ নিয়ে মিথ বা লোককাহিনির শেষ নেই। বন্ধুরা, তোমরা যদি ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করো, তবে জেনে রাখো পৃথিবীতে লাখো মানুষও ভূতে বিশ্বাস করে। পৃথিবীতে প্রায় সব সংস্কৃতিতেই ভূতের বিশ্বাস আছে। ভূতের অস্তিত্ব নিয়ে মানুষের কৌতূহলের কোনো শেষ নেই। লোকজ সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস আর অতিপ্রাকৃত ঘটনার মিশ্রণে 'ভূত' শব্দটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে হাজারো মিথ বা রহস্যময় ধারণা। মিথ বা পৌরাণিক কাহিনি হলো, প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা কাল্পনিক গল্প। বিজ্ঞান যেখানে যুক্তি খোঁজে, সেখানে ভূত আমাদের কল্পনার জগতে এক অন্যরকম শিহরণ তৈরি করে।

ভূত নিয়ে সমাজে প্রচলিত কিছু চমকপ্রদ ও অদ্ভুত মিথ ও বাস্তবতা তুলে ধরা হলো:

১. অতৃপ্ত আত্মা: সবচেয়ে প্রচলিত মিথ হলো– কোনো ব্যক্তি যদি অপঘাতে বা অপূর্ণ ইচ্ছা নিয়ে মারা যান, তবে তার আত্মা 'মুক্তি' পায় না। এই আত্মাগুলোই নাকি পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়।

বাস্তবতা: এটি মূলত মানুষের শোক কাটিয়ে ওঠার এবং ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা থেকে আসা একটি মনস্তাত্ত্বিক ধারণা।

২. পোড়োবাড়ির রহস্য: মানুষ মনে করে নির্জন পুরোনো বাড়িতে ভূতের বসবাস বেশি। বিশেষ করে অশ্বত্থ গাছ বা শেওড়া গাছকে ভূতের আস্তানা ভাবা হয়।

বাস্তবতা: নির্জন স্থানে শব্দের অভাব বা আবছা আলোয় আমাদের মস্তিষ্ক পরিচিত আকৃতি খুঁজতে গিয়ে হ্যালুসিনেশন তৈরি করে, যা আমাদের কাছে ভৌতিক মনে হয়।

৩. অমাবস্যা ও পূর্ণিমার প্রভাব: প্রচলিত আছে, অমাবস্যার রাতে অপশক্তি বা অশুভ আত্মার শক্তি বেড়ে যায়। অনেক সংস্কৃতিতে আবার পূর্ণিমার রাতকে নেকড়ে মানব বা অশরীরীদের সময় বলে ধরা হয়।

বাস্তবতা: এ অতিপ্রাকৃত প্রভাবের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। এটি কেবলই দীর্ঘদিনের এক লোককথা।

৪. আয়নায় ভূতের অবয়ব: একটি জনপ্রিয় মিথ হলো, আয়নার সামনে অন্ধকার ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দাঁড়ালে পেছনে কাউকে দেখা যায়।

বাস্তবতা: একে বলা হয় 'ট্রক্সলার্‌স ইফেক্ট' (Troxler's fading)। কম আলোয় আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখের স্নায়ুগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং মস্তিষ্ক তখন নিজের চেহারার ওপর অন্য কোনো কাল্পনিক ছবি বা বিকৃতি চাপিয়ে দেয়।

৬. 'ডেভিলস আওয়ার' (Devils Hour): বলা হয়, রাত ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে ভূতের উপদ্রব সবচেয়ে বেশি হয়। একে অনেকে 'শয়তানের সময়' বলে থাকেন।

বাস্তবতা: এটি মূলত একটি মনস্তাত্ত্বিক চক্র। মানুষের ঘুমের গভীরতম পর্যায় এবং শরীরের তাপমাত্রা এই সময়ে সবচেয়ে কমে যায়। হুট করে এই সময়ে ঘুম ভেঙে গেলে মানুষ কিছুটা বিভ্রান্ত বা ভীত বোধ করে, যা থেকে হ্যালুসিনেশন হতে পারে।

৭. ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ডিস্টার্বেন্স: অনেক সময় টিভি নিজে নিজে চালু হওয়া, রেডিওতে অদ্ভুত শব্দ হওয়া বা মোবাইলের ব্যাটারি হুট করে কমে যাওয়াকে ভূতের কাজ বলে মনে করা হয়।

বাস্তবতা: এর পেছনে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ডের (EMF) পরিবর্তন বা ডিভাইসের কারিগরি ত্রুটি দায়ী থাকে। তবে হরর সিনেমাগুলোতে এই ঘটনাকে এত বেশি ব্যবহার করা হয়েছে যে, মানুষ একে এখন বাস্তব বলে বিশ্বাস করে।

৮. 'বোবায় ধরা': আমরা অনেকেই মনে করি, ঘুমের মধ্যে কোনো ভূত বা অপশক্তি আমাদের বুকের ওপর চেপে বসে, যার ফলে আমরা নড়াচড়া করতে পারি না বা চিৎকার করতে পারি না। বাংলায় একে 'বোবায় ধরা' বলা হয়।

বাস্তবতা: চিকিৎসা বিজ্ঞানে একে বলা হয় 'স্লিপ প্যারালাইসিস' (Sleep Paralysis)। আমাদের মস্তিষ্ক জেগে গেলেও শরীর যদি তখনও গভীর ঘুমের মোডে থাকে, তখন স্নায়ু ও পেশির মধ্যে এই সাময়িক অসামঞ্জস্য তৈরি হয়।

আরো কিছু বিচিত্র মিথ:

- চোখের কোণ দিয়ে কালো কোনো ছায়াকে দ্রুত চলে যেতে দেখা। (বৈশ্বিক মিথ)

– নির্জন পথে কেউ নাম ধরে ডাকলে পেছনে তাকাতে নেই, তাকালে ঘাড় মটকে দেয়। (গ্রামীণ বাংলা ও মালয় লোককথা)

– সন্ধ্যার পর খোলা খাবার (বিশেষ করে মিষ্টি, মাছ বা মাংস) নিয়ে বাইরে গেলে ভূত পিছু নেয়।

ভূতের এই মিথগুলো কেন টিকে আছে জানো? কারণ মানুষ ভয় পেতে ভালোবাসে, যা শরীরে ডোপামিন ও অ্যাড্রেনালিন নিঃসরণ করে। অজানার প্রতি কৌতূহল, মৃত্যুর পর কী হয়, সেই অজানাকে ব্যাখ্যা করতেই ভূতের গল্পের জন্ম। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রূপকথা এবং ঠাকুমার ঝুলি থেকে শুরু করে হরর সিনেমা–সবই এই মিথগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ❑

ভূতের প্রবাদ প্রবচন

বাংলা লোকসংস্কৃতিতে ভূত নিয়ে অনেক প্রবাদ-প্রবচন প্রচলিত আছে, যা মূলত মানুষের ভয়, কুসংস্কার বা অদ্ভুত আচরণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। জনপ্রিয় প্রবাদগুলোর মধ্যে অন্যতম- কিছু ভূতের প্রবাদ-প্রবচন ও তাদের অর্থ দেওয়া হলো তোমাদের জন্য:

সর্ষের মধ্যে ভূত: রক্ষক যখন ভক্ষক হয়। অর্থাৎ যে সমস্যার সমাধান করবে, সমস্যার মূলে সে নিজেই থাকে।

দশচক্রে ভগবান ভূত: অনেক লোকের ষড়যন্ত্র বা অপপ্রচারের ফলে একজন ভালো ও সম্মানিত ব্যক্তিও সমাজে খারাপ বা মন্দ হিসেবে পরিচিতি পায়।

ভূতের মুখে রাম নাম: খারাপ লোকের মুখে সৎ কথা শোনা।

পেতনি বলে, আমার বাপের বাড়ির লোক ভাল: নিজের দোষ দেখতে না পাওয়া, নিজের সবাইকে ভালো মনে করা।

ভূতের বেগার: কোনো লাভ বা প্রতিদান ছাড়া কাজ করা।

ভূতের পা উলটো দিকে: স্বাভাবিকের উলটো আচরণ করা।

পয়সা থাকলে ভূতের বাপেরও শ্রাদ্ধ হয়: অর্থের বা ক্ষমতার জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।

মেছো ভূত: মাছের প্রতি ভীষণ লোভী ব্যক্তিকে ডাকা হয়।

গোভূত: গোঁয়ার বা বোকাসোকা প্রকৃতির মানুষ।

এসব প্রবাদ বাংলার গ্রাম্য জীবনের সাথে মিশে আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রতিবেদন: আনিসা নাওয়ার



মাইশা মেহজাবিন, সপ্তম শ্রেণি গালিমপুর রহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়,নবাবগঞ্জ, ঢাকা

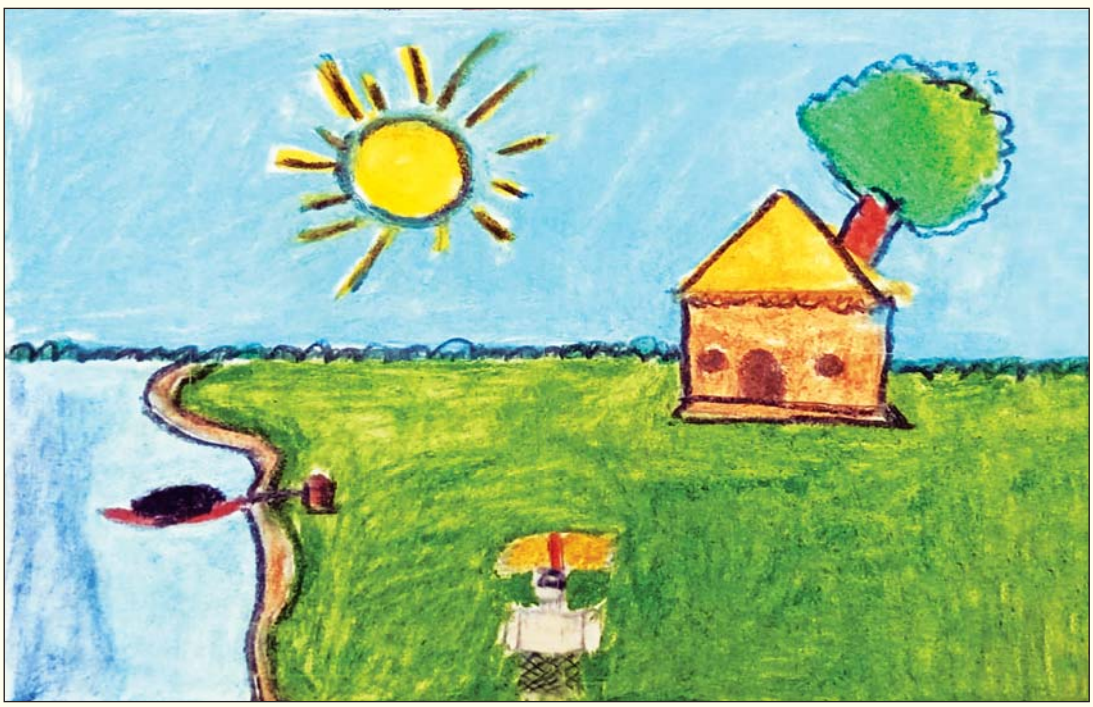

আরিশা হাসান, তৃতীয় শ্রেণি সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুল, ঢাকা



মীর্জা মাহের আসেফ, নবম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল



তাহসিন ইসলাম রুহি, পঞ্চম শ্রেণি, বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-50, No-5. November 2025, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022



আবু সালেহ, ষষ্ঠ শ্রেণি, রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা